গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১৭-২৩ ডিসেম্বর ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

লকআউট ক্লোজারই কর্মনাশা — বন্‌ধ নয়

বন্‌ধ ‘কর্মনাশা’, বন্‌ধ করলে ‘উন্নয়ন ব্যাহত’ হয়, আন্দোলন করলে, মিটিং মিছিল ধর্মঘট করলে পুঁজি আসে না, পুঁজি না এলে ‘উন্নয়ন’ ঘটে না, কাজেই ‘উন্নয়নের স্বার্থে’ বন্‌ধ, আন্দোলন বন্ধ করা দরকার — বন্‌ধবিরোধী এই প্রচার এখন চলছে গণমাধ্যম জুড়ে। বন্‌ধ বিরোধীরা আরও বলে থাকেন — ‘সাধারণ মানুষ বন্‌ধ সমর্থন করেন না’।

গণমাধ্যমের একপেশে প্রচার

টিভিতে নিত্যদিন দেখাচ্ছে, যেন সাধারণ মানুষ সবাই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন। তারা কজনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, ছেঁটে কেটে কজনকে দেখাচ্ছে, যাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে তারা কারা — এসব জানবার কোন উপায় নেই। প্রশ্ন হল — যিনি পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না, তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে, হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি তিনি সমর্থন করেন কি না? বন্ধ কারখানার শ্রমিককে কি জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি কী মনে করেন শিল্পায়নের প্রচার সম্পর্কে? ধরা যাক, ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে পথ অবরোধ সম্পর্কে এক যাত্রীকে বলা হচ্ছে — ‘‘আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে?’’ কী উত্তর তিনি দেবেন? বলবেন — ‘‘না, আমার আরাম হচ্ছে?’’ তিনি বলছেন ‘‘অসুবিধা হচ্ছে’’, সেটাই এমনভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে যেন তিনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে! কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হতো — ‘‘ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অবরোধ করা উচিত কি?’’, বা ‘‘এই এই দাবিতে বন্‌ধ অবরোধ আপনি সমর্থন করেন কি?’’ তাহলেই উত্তরটা অন্যরকম হতো। বড় জোর উত্তর হতো, ‘‘এসব করে কি দাবি আদায় হবে?’’ বন্‌ধ করে কিছু হয় না — এই প্রচার ক্রমাগত শুনতে শুনতে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ সাংবাদিকদের পেশাদারি দক্ষতায় করা প্রশ্নের সামনে কখনো দিশাহারা হয়ে পড়েন না, তাও নয়। তখন তাদের উত্তর গুলিয়ে যায়। বহুক্ষেত্রেই প্রশ্নটা করা হয় জনগণের স্বাধীন মতামত জানার জন্য নয়; পেশাদারী দক্ষতায় প্রশ্নকর্তার অভিপ্রেত উত্তরটা মানুষের মুখ থেকে টেনে বার করার জন্য। কিন্তু প্রতিবাদ না করলে যে কিছুই পাওয়া যায় না — এটাও মানুষই বলেন। দামবৃদ্ধি, ভাড়া বৃদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধির পর বাসে ট্রামে অহরহ মানুষ দুঃখ করে বলে থাকেন — ‘‘কেউ কিছু করছে না’’। এটা অবশ্য গণমাধ্যম দেখায় না। ইছামতী সংস্কারে ২০০০ সালে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সরকার পালন করেনি, হাজার হাজার মানুষ গাঁইতি কোদাল দিয়ে ইছামতীর ধারাকে মুক্ত করেছে। উনিশ বছর নানা ধরনের আন্দোলনেও ইংরেজি ফিরিয়ে দেয়নি সিপিএম সরকার, ১৯৯৮ সালে বন্‌ধের পর তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। হাসপাতালের চার্জ, শিক্ষায় বেতন যতটা বাড়াতে চেয়েছে, ততটা সরকার পারেনি আন্দোলনের চাপে। সাফল্যের এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে, যা গণমাধ্যম তুলে ধরে না। আন্দোলনের ফলেই পাশফেল প্রথা ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে আরও আন্দোলন দরকার। কথায় বলে — ‘না কাঁদলে মায়ে দুধ দেয় না’ — এটা জনগণের জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রবাদ। কাজেই প্রতিবাদ মানুষকে করতেই হবে।

বন্‌ধ গণপ্রতিবাদের হাতিয়ার

বন্‌ধ জনগণের প্রতিবাদ ও দাবিকে জোরালোভাবে তুলে ধরারই একটা কর্মসূচি, একটা হাতিয়ার। সে হাতিয়ার যে কত জোরালো তা সরকার ও প্রশাসনের ‘গেল গেল’ রব দেখে বোঝা যায়। বছরে ক’দিন বন্‌ধ হয়? গত ৮ বছরে বন্‌ধ হয়েছে ২২ দিন। অথচ যখন বন্যায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ পথ ঘাট ডুবে থাকে তখন — ‘একদিনের জন্যও বন্‌ধ চলবে না’ বলে যাঁরা ফতোয়া দিচ্ছেন — তাঁরা বলেন না, ঘন ঘন খরা বন্যায় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। খরা বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করার জন্য কী চেষ্টা করেন বন্‌ধ বিরোধীরা? দেশের নানা রাজ্যে জাতিদাঙ্গা ভাষাদাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দিনের পর দিন উৎপাদন বন্ধ থাকে — তখন প্রশাসন, সরকার, বিচারবিভাগ কী করে? আর্থিক সমৃদ্ধিতে শীর্ষস্থানীয় রাজ্য গুজরাটে সম্প্রতি দাঙ্গা চলেছে মাসের পর মাস, কলকারখানা, ক্ষেতখামারে উৎপাদন সব বন্ধ থেকেছে, অথচ দেশের বণিকসভাগুলি ‘‘গেল গেল উন্নয়ন গেল’’ বলে রব তোলেনি। দাঙ্গার নায়ক বিজেপিকে অকাতরে অর্থ সাহায্য দেওয়াও তারা বন্ধ করেনি। দেশে লক্ষ লক্ষ কলকারখানা লকআউট, ক্লোজার, উৎপাদন বন্ধ কিন্তু তাতেও ‘গেল গেল’ রব নেই। শ্রমিক প্রতিবাদ আন্দোলন করে বলছে ‘কারখানা খুলতে হবে’, বন্‌ধ না করলে তার সেই কথা কি কেউ শুনবে? বলতে পারেন — ‘বন্‌ধ করলেই কি শুনবে?’ সঠিক উত্তর হবে — ‘একদিন বন্‌ধে না হলে বারবার বন্‌ধ হবে, দু-দিন, সাতদিন টানা বন্‌ধ হবে।’’ পাশের দেশ বাংলাদেশের মানুষ লড়াই, আন্দোলন করে, দিনের পর দিন বন্‌ধ করে গোটা দেশ অচল করে দিয়ে দু’বার সামরিক শাসনের অবসান ঘটায়নি?

শাসকরা এসব ভালো করেই জানে, তাই তারা নানা মিথ্যা প্রচার জোরগলায় চালিয়ে জনগণকে বন্‌ধ-এর বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে চায়। ইদানীং বন্‌ধ-এর বিরোধিতায় তারা যেটা সবচেয়ে বেশি বলছে তা হল — বন্‌ধ কর্মনাশা, বন্‌ধ শিল্পায়নের প্রতিকূল, বন্‌ধ-এর জন্য উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কথাটা নতুন কিছু নয়, মালিকগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরেই কথাটা বলে আসছে। কিন্তু ইদানীংকালে বিশেষত এ রাজ্যে সিপিএম নেতারা বুর্জোয়াদের সুরে সুর মিলিয়ে ‘শিল্পায়ন’ ও ‘উন্নয়নের’ ধুয়ো তোলায় মালিকশ্রেণীর বন্‌ধবিরোধী মিথ্যা প্রচার জনমনে খানিকটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। একটু গভীরে ঢুকলে, একথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না যে —

প্রথমত - বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণের কোন উন্নতি হয় না।

দ্বিতীয়ত - বন্‌ধ বা আন্দোলন করা বা না করার ওপর ‘শিল্পায়ন’

সাতের পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকার চাইলেই বিদ্যুৎমাশুল কমাতে পারে

পশ্চিমবঙ্গে গৃহস্থ ও ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মাশুল নির্ধারণ নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে সিপিএম নেতৃত্ব যে জনগণকে এতকাল মিথ্যা বলে চলেছে, এবার কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যানের কথাতেই তা আবার প্রমাণ হয়ে গেল। গত ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় সিআইআই আয়োজিত নয়া বিদ্যুৎ আইন প্রসঙ্গে এক আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান অশোক বসু বলেছেন, ‘‘রাজ্য সরকার চাইলেই রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে বাধ্য করতে পারে বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর জন্য। শুধু তাই নয়, পারস্পরিক ভরতুকি পুরোপুরি তুলে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনও সময় দেওয়া না থাকায় প্রায় কোন রাজ্যই এই ভরতুকি তোলার চেষ্টা করছে না বলে অশোকবাবু জানিয়েছেন।’’ (সংবাদ প্রতিদিন ৮-১২-০৪)। কিন্তু অশোকবাবু যেটা বলেন নি, তা হল, ‘প্রায় কোন রাজ্যের’ ঐ তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ নেই। এ রাজ্যে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার, অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দল পরিচালিত সরকারগুলোর থেকে কয়েক কদম এগিয়ে জনগণের ঘাড়ে মাশুলবৃদ্ধির বোঝা চাপানোর রেকর্ড করেছে। বাস্তবিক রাজ্যে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন, দফায় দফায় মাশুলবৃদ্ধি থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয়ে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার অন্যান্য রাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, জনগণকে বিভ্রান্ত করে বাড়তি

ছয়ের পাতায় দেখুন

১৮ নভেম্বর ২ লক্ষ গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে অ্যাবেকার ডেপুটেশন

গণশক্তিতে বিজ্ঞাপন, তৃণমূল পুরসভার কর হ্রাস

অনলাইন লটারির জুয়া জাঁকিয়ে বসছে

অনলাইন লটারি নামক জুয়াখেলায় সর্বস্ব হারিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। রাজ্য সরকারের লাইসেন্স নিয়ে এই জুয়াখেলা সর্বত্র জাঁকিয়ে বসেছে। এই জুয়াখেলার ব্যাপক প্রসারের জন্য শাসক দল সিপিএম দলীয় মুখপত্র ‘গণশক্তি’তে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কলকাতা পুরসভা ট্যাক্স কমিয়ে দিয়ে এই জুয়ার ব্যবসা মহামারির মতো ছড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। গত ৮ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার অধিবেশনে লটারির মেশিন পিছু বার্ষিক কর ১৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩ হাজার টাকা করার প্রস্তাব পেশ হয়। মেয়র সুব্রত মুখার্জী বলেছেন ‘‘অনলাইন লটারিতে কর হ্রাস করার প্রস্তাব পাস হয়ে গিয়েছে। চাপ সৃষ্টি করে লাভ নেই। আমাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না। এতে পুরসভারই রোজগার বাড়বে’’ (আনন্দবাজার, কলকাতা, ৯-১২-০৪)। অনলাইন লটারি থেকে কলকাতা পুরসভা এবং সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স আদায় করছে। এরাই চলতে দিয়েছে অনলাইনের জুয়া।

জুয়াখেলার নিয়মই হল ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে যদি খেলোয়াড় জেতে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে জুয়া বোর্ডের মালিক জিতবে। এর মধ্যে ভাগ্য কিছু নেই, আভ্যন্তরীণ কৌশলটাই এইরকম। ফলে ৯০% ক্ষেত্রেই যারা খেলতে যায় তারা হারে। অঙ্কের সম্ভাব্য বিদ্যায় (probability) এই মর্মে আলোচনা আছে। সুতরাং খেলতে গিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ সর্বস্ব হারাচ্ছে এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের সামনে পথ না পেয়ে অনেকেই আত্মহত্যা করছে। ক্রমবর্ধমান এই

আটের পাতায় দেখুন

অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে ডিএসও-ডিওয়াইও’র বিক্ষোভ

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে

মুজফ্‌ফরপুরে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিক্ষোভ

পেট্রল-ডিজেল, রান্নার গ্যাসের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় ইউ পি এ সরকারের সমস্ত জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে ২৫ নভেম্বর বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে শ্রমিক কর্মচারীরা বিক্ষোভ দেখান। বেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট থেকে মিছিল বের হয়ে জুব্বা সাহনি পার্কে যায়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, এ আই টি ইউ সি, এ আই সি টি ইউ, ইউ টি ইউ সি, এবং এ আই সি সি টি ইউ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উত্তর ২৪ পরগণা

গাইঘাটা থানা নিষ্ক্রিয়, গ্রেপ্তারের দাবিতে জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা থানার সুটিয়ায় ২ ডিসেম্বর গভীর রাতে সিপিএম দলভুক্ত একদল দুষ্কৃতি বিড়ি শ্রমিক ঝর্ণা মণ্ডলকে হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায়। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে এবং ধর্ষকদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ৪ ডিসেম্বর গাইঘাটা থানায় দলের মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু দুষ্কৃতিরা সিপিএম দলভুক্ত হওয়ায় গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। ৯ ডিসেম্বর অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অবশেষে জেলাশাসকের দপ্তরে তিন শতাধিক মহিলা বিক্ষোভ দেখান। প্রথমে জেলা শাসক স্মারকলিপি গ্রহণে আসতে না চাইলে উপস্থিত জনতা তীব্র ধিক্কারে ফেটে পড়েন। আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত তিনি স্মারকপত্র গ্রহণ করেন এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। ধর্ষকদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা এবং উদাসীনতার এহেন নজির চলতে থাকলে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার নাগরিক জীবনকে আরও বিপন্ন করে তুলবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদিনের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা বিড়ি শ্রমিক সমন্বয় কমিটির পক্ষে সভাপতি চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, সম্পাদক অশোক দাস এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে জেলা সম্পাদিকা শিবানী হালদার ও ননীবালা বিশ্বাস। বক্তারা প্রত্যেকেই সিপিএম-সমাজবিরোধী এবং পুলিশী চক্রের অশুভ যোগসাজসের তীব্র নিন্দা করেন।

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন, ক্যাপিটেশন ফি-র প্রতিবাদে এবং শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ২৭-২৮ নভেম্বর কান্দি শহরে অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র ৭ম মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র সম্মেলন।

কান্দি হ্যালিফক্স ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি প্রবীণ বামপন্থী ব্যক্তিত্ব সুহাস কুমার দাস। তিনি ডিএসও'র আন্দোলনের প্রতি গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং শিক্ষা সহ সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান। সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শাসনে নিপীড়িত শোষিত মানুষ মুক্তির জন্য বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে শোষিত মানুষের আন্দোলনের শক্তিকে ভিত্তি করেই সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে তারা কংগ্রেসের মতোই পুঁজিবাদের সেবা করছে; আর তা করছে বলেই তারা ভারতবর্ষের মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যে ২৭ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে। ফলে ছাত্র সংগঠন ডিএসও'কে বামপন্থার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে ছাত্র আন্দোলনকে সমাজ মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহসভাপতি কমরেড মৃদুল দাস বলেন, সর্বশিক্ষা অভিযান ও অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সুচতুর কৌশলের মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষাকে সমূলে বিনাশ করার চক্রান্ত চলছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি ছাত্র সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষদের আহ্বান জানান।

এছাড়াও সংগঠনের জেলা সম্পাদক বরুণ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের শুরুতেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের যোদ্ধা প্যালেস্তাইন ও আরব জনগণের নেতা ইয়াসের আরাফতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে নীরবতা পালন করা হয়। আর্সেনিক দূষণ, বন্যা ভাঙন ও খরা সমস্যার নিরসনে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৮ নভেম্বর প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কান্দি কমার্স কলেজে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল এবং অল ইন্ডিয়া ডিএসও'র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড মহীউদ্দিন মান্নান। কমরেড স্বপন ঘোষাল মনীষীদের জীবনের নানাদিক তুলে ধরে দেখান ছাত্রজীবন থেকেই আন্দোলন, চরিত্র গড়ে তোলার সাধনা প্রয়োজন। কমরেড মহীউদ্দিন মান্নান ডিএসও গড়ে ওঠার সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে আগামী ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বভারতীয় ছাত্র সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানান। কমরেডস্ অনুপ সিন্‌হাকে সভাপতি ও অভিজিৎ মণ্ডলকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের জেলা কমিটি ও ৬২ জনের জেলা কাউন্সিল গঠন করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, প্রবীণ বামপন্থী নেতা সুহাস কুমার দাস

প্যারাটিচার স্থায়ী শিক্ষকের বিকল্প হতে পারেনা

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ৯ ডিসেম্বর ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল রানি রাসমণি রোডে গেলে পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা। অন্যান্য নেতৃবৃন্দও ভাষণ দেন। বক্তারা বলেন, রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ — প্যারাটিচার নিয়োগ — শিক্ষা জগতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। রাজ্যে ৪৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য। পূর্ণ বেতনে সেই সমস্ত পদে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী কোন উদ্যোগ নেই। এই পদগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য পড়ে আছে। রাজ্য সরকারের অর্থের ভিত্তিতে এই পদগুলি পূরণ করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকার সে পথে না গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকায় মাত্র ১০০০ টাকার বিনিময়ে প্যারাটিচার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য — এই প্যারাটিচার কখনও পূর্ণ বেতনের শিক্ষকের বিকল্প হতে পারে না। চরম বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে সরকার এই হীন কাজে নেমেছে।

স্কুলে স্কুলে প্যারাটিচার নিয়োগ হলে লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্ন ঘটবে। শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি শিক্ষাজগতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। সরকার সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে আসন্ন ভোটে ফয়দা লোটার জন্য এভাবে হাজার হাজার প্যারাটিচার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের বক্তব্যে এটা সুস্পষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকার যখন প্রাথমিকে ২০০০ টাকা ও মাধ্যমিকে ৪০০০ টাকায় প্যারাটিচার নিয়োগের কথা বলছে — তখন রাজ্য সরকার তা কমিয়ে অর্ধেক টাকার বিনিময়ে নিয়োগ করতে চাইছে।

এই সমস্ত প্যারাটিচারদের চাকরি সম্পূর্ণ অস্থায়ী। চুক্তির ভিত্তিতে এদের নিয়োগের অর্থ যেকোন মুহূর্তে এদের চাকরি চলে যেতে পারে। এছাড়া বেতন বৃদ্ধি, পি এফ, পেনসন কিছুই এরা পাবে না। ভবিষ্যতে এরা একটা বিরাট সমস্যা হিসাবে দেখা দেবে — যা শিক্ষা ক্ষেত্রকে চরম অস্থির করে তুলবে।

পাশাপাশি সর্বশিক্ষা অভিযানের নামে শিক্ষা সংহারের এক সুচতুর পরিকল্পনা চলছে। কোন নতুন স্কুল তৈরি হচ্ছে না। অথচ নাকি লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। আসল উদ্দেশ্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে তুলে দেওয়া। এই প্রসঙ্গেই বক্তারা প্রাথমিকে পাশফেল ফিরিয়ে আনার দাবি তোলেন।

প্রাইমারি কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে চরম দলবাজির আশঙ্কা রয়েছে। সরকার পক্ষ এই সংকীর্ণ খেলায় মত্ত। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি লঙ্ঘনের হীন অপচেষ্টা চলছে।

এছাড়া মাস পয়লা বেতন প্রাপ্তির কোন সুযোগ অদ্যাবধি শিক্ষকদের নেই। মাসের কোন তারিখে বেতন আসবে শিক্ষকরা জানেন না। সেপ্টেম্বর থেকে চার শতাংশ মহার্ঘভাতা অদ্যাবধি শিক্ষকরা পাননি।

এর সঙ্গে রয়েছে শিক্ষকদের দিয়ে শিক্ষাবহির্ভূত বিভিন্ন কাজ করানোর প্রবণতা। ভোটের কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সার্ভে, জনগণনা ইত্যাদি নানা কাজে শিক্ষকদের লাগান হয়। এছাড়া স্কুলে চাল বিলি থেকে নানা কাজ শিক্ষকদের করতে হয়। তাছাড়া বিভিন্ন ট্রেনিং, স্পোর্টস সহ প্রতিনিয়ত মিটিং-এ শিক্ষকদের যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, যখন শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কাজটাই গৌণ হয়ে পড়ে।

হতাশা নয়, সঠিক নেতৃত্বে শ্রমিকআন্দোলনই একমাত্র পথ

শ্রমিকদের প্রতি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র আহ্বান

জনগণই বলেন, এস ইউ সি আই হচ্ছে আন্দোলনের দল। জনগণের কোন অংশই আজ মালিকী ও সরকারি আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না এবং প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন ক্ষেত্রে আক্রমণ ঘটছেই। ফলে আক্রমণের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনও বিরামহীনভাবে চলছে। ১৭ নভেম্বর ২৪ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধে বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সকল অংশের সাধারণ মানুষ আন্দোলনের পক্ষেই রায় দেন। ঐদিনই এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, জনগণের ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন চলতে চলতেই যেমন বন্‌ধের কর্মসূচি এসেছে, তেমনই বন্‌ধের পরও আন্দোলন চলবে এবং তা চলছেও। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৫ নভেম্বর রাজ্যব্যাপী বিদ্যুৎ আলো বর্জনের কর্মসূচিতে জনগণের সাড়া ছিল ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত। ১ ডিসেম্বর দিল্লির বুকে দৃপ্ত মহিলা মিছিল নারী আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। ১৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও খেতমজুররা আইন অমান্য করে নিজেদের দাবিগুলি তুলে ধরেছেন। ১৭ ডিসেম্বর ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী)র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ডাক দিয়েছে আইন অমান্যের।

আজ শ্রমিক জীবনে যে ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এসেছে, সংকট যেমন তীব্র রূপ নিয়েছে, ইতিপূর্বে তা দেখা যায়নি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্ট তীব্র বাজার সংকটের সমস্ত দায়ভার শোষিত বঞ্চিত শ্রমিক সমাজের কাঁধে চাপিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্মসংস্কৃতি ও উৎপাদনের দায়বদ্ধতার কথা বলছে। উন্নয়নের নামে বিশ্ববাজারের অলীক সম্ভাবনার গালভরা গল্প প্রতিদিন নানা ঢংয়ে, নানা রঙে সরকারি ও বেসরকারি প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ব্যক্তিপুঁজির প্রবেশের দরজা খুলে দিচ্ছে, এমনকী লাভজনক সংস্থাগুলিকেও বিক্রয় করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও একই কাজ করে চলেছে। অপরদিকে শূন্যপদগুলি অবলুপ্ত করে একই শ্রমিককে একাধিক শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সংকুচিত হচ্ছে কাজের সুযোগ। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশ ঘটতে দিয়ে ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিরা বিদেশের বাজারের ভাগ পেতে চাইছে। কেন্দ্রে সরকারে যে-ই থাকুক, রং বচনে যা-ই পার্থক্য থাকুক, দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে গৃহীত নীতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। বিদ্যুৎ, রেল, ডক, খনি, ব্যাঙ্ক ও সড়ক পরিবহনের মত পরিকাঠামোগত শিল্পে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিপুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সাধারণ মানুষকে চূড়ান্ত শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে। অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা, যা একদা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রেখে জনগণের টাকায় গড়ে তোলা হয়েছিল আজ সেইসব পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকেও ব্যক্তিপুঁজির হাতে তুলে দিয়ে বাজার সংকটের হাত থেকে পুঁজিপতিদের রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন-রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত পরিষেবাকে পণ্যে রূপান্তরিত করে সাধারণ মানুষকে তা অধিক দামে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাঁধে বিপুল আর্থিক বোঝা চাপিয়ে সরকার শিল্পপতিদের সস্তায় বিদ্যুৎ দিচ্ছে। পেট্রোল ডিজেলের ওপর বিপুল পরিমাণ কর বসিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা আদায় করছে। সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। পি এফের সুদ কমানো হচ্ছে। অবসরকালীন ভাতার দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্ট সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং সমস্ত প্রকার ধর্মঘটের বিরুদ্ধে মত দিয়েছে, যাকে সামনে রেখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকারের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে।

মুখে শ্রমিক আন্দোলনের কথা বললেও কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক জনস্বার্থবিরোধী নীতির সার্থক রূপকার বামফ্রন্ট সরকার একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে। ভি আর এস / ই আর এস-এর নামে অথবা সরাসরি ছাঁটাই করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হচ্ছে। সরকার শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ করেছে। চটশিল্পে উৎপাদনভিত্তিক বেতন চালু করার কালা চুক্তি করা হয়েছে। সি ই এস সি'তে রাজ্য সরকার ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ইউনিয়নের মদতে ভি এস এস-এর নামে ২৩০০ শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। ওয়েবেলে পাঁচটি ইউনিট বন্ধ করে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়েছে। মাসিক ৫০ টাকা বেতনে কর্মরত সি এইচ জি কর্মীদের ওপর চলছে মধ্যযুগীয় শোষণ। সরকারি আইনকে অবজ্ঞা করে বিড়ি শিল্প সহ ৫৪টি শিল্পে ন্যূনতম মজুরির অর্ধেক টাকায় শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের নেই কোন সামাজিক সুরক্ষা। নেই বাসস্থান। এরা সর্বহারার দল, ছিন্নমূল। পুঁজিবাদসৃষ্ট শ্রমের বাজারে চলমান শ্রমশক্তি। শ্রমিক কর্মচারীর কাছ থেকে কেটে নেওয়া পি এফ, গ্রাচুইটির টাকা আত্মসাৎকারী মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে সমূলে ধ্বংস করতে শাসকদল ও সরকার রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন, ঘেরাও ধর্মঘট বরদাস্ত করবেন না। অথচ আইন থাকা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার লকআউটকে কেন বেআইনি ঘোষণা করছে না — এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাতকারী মালিকদের ফৌজদারি ধারায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। বরং শিল্পে শান্তি স্থাপনের ধুয়া তুলে সরকার লাঠিগুলি চালিয়ে শ্রমিক আন্দোলন হত্যা করে চলেছে। ন্যাশনাল লেবার সার্ভের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আজ পশ্চিমবাংলায় লকআউট ও ক্লোজারে বন্ধ হয়ে গেছে ২৯০০০ কারখানা যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৭০ শতাংশ কারখানা রেজিস্ট্রিকৃত নয়। **সরকারিভাবে প্রায় ৬৮ লক্ষ (প্রকৃত অর্থে দেড় কোটি) কর্মহীন বেকারের দীর্ঘশ্বাস এই বাংলার ঘরে ঘরে আর্তনাদ সৃষ্টি করছে।** জনবিরোধী শিল্প ও বাণিজ্যনীতির প্রতিবাদে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি কোন আন্দোলন গড়ে তোলবার কোন চেষ্টা তো করছেই না বরং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে গৃহীত শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতিকেই বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাই দেখা যাচ্ছে সিটু,

১৭ ডিসেম্বর শ্রমিক আইন অমান্য

প্রতিহত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন না করে, নিছক ভোটের রাজনীতিতে বিজেপিকে প্রধান শত্রু রূপে সামনে এনে ভারতীয় পুঁজির বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে সিপিএম আজ কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। যখন চা বাগানের ভুখা শ্রমিক অনাহারে অপুষ্টিতে মরছে, বিড়ি শিল্প সহ ৫৪টি শিল্পে ন্যূনতম মজুরির অর্ধেক টাকায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে অসংগঠিত শ্রমিকরা, নির্মম শোষণে যখন তারা মৃত্যুপথযাত্রী, তখন অস্বীকার করা হচ্ছে কারখানার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার। আবাসন শিল্পে চূড়ান্তভাবে শোষিত হচ্ছে গ্রাম থেকে আগত লক্ষ লক্ষ অসংগঠিত শ্রমিক। ন্যূনতম মজুরি দূরে থাক দু'বেলা খাবার পয়সা তারা পান না, দিনে প্রায় ১২ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা।

রাজ্যের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের কর্ণধার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মালিকের দেওয়া মালায় ভূষিত হয়ে গর্বিত সুরে উন্নয়নের বাণী দিয়ে বেড়াচ্ছেন, ফিতে কাটছেন, ভোজ সভায় শিল্পপতিদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে মৌ স্বাক্ষর করছেন। যার পরিণাম ১৯৮৫ - ২০০৩ পর্যন্ত চাকরি হয়েছে মাত্র ৪৩,৩৪৯ জনের, আর চাকরি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন ১২,৭৯,০৮৬ জন (সূত্র ঃ ন্যাশনাল লেবার সার্ভে)। কাজ হারানো শ্রমিকদের বিক্ষোভ থেকে বাঁচতে নিরাপত্তাবলয় বাড়ানো হচ্ছে। গড়ে তোলা হচ্ছে স্পেশাল ইকনমিক জোন, যেখানে থাকবে না ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার। যার অর্থ মালিকরা ওখানে যেমন খুশি শর্তে যথেচ্ছ শোষণ করতে পারবে শ্রমিক কর্মচারীদের।

এই অবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সিইএসসিতে ভিএসএস-এর বিরোধিতা না করে ভিএসএস-র শর্ত কী হবে তা নির্ধারণের জন্য সিইএসসি-র কর্মচারীদের কাছ থেকে গণভোটের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ করার কথা বলছে। শ্রমিকশ্রেণী লড়ে শ্রেণীচেতনায়, প্রশাসনিক সহায়তায় নয়। এই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির শ্রেণী চেতনাহীন অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলনই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে হতাশা, অবিশ্বাস। পাশাপাশি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে পরিচালিত ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে একদিকে যুক্ত আন্দোলনকে সঠিকখাতে পরিচালিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে একক উদ্যোগে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলে মালিকশ্রেণীর ভয়াবহ আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর ওপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণ এবং মুনাফা লোভী পুঁজিপতিদের সাঁড়াশি আক্রমণের মোকাবিলায় প্রতিটি কারখানায়, প্রতিটি প্ল্যান্টে প্রচার অভিযান, ডেপুটেশন, গেটসভা, জেলা লেবার দপ্তরে বিক্ষোভ সংগঠিত করার মাধ্যমে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, আগামী ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বেলা ১২টায় শ্রমিক-কর্মচারীরা সমবেত হবেন আইন অমান্যের জন্য।

হতাশা বাঁচার পথ দেখায় না, সঠিক উদ্দেশ্যে উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনই পারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী আক্রমণকে প্রতিহত করে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করতে।

১৮ বছরে ১২ লক্ষ ৭৯ হাজার কাজ হারিয়েছে, পেয়েছে ৪৩ হাজার ৩৪৯। এ কেমন শিল্পায়ন?

সাল	নতুন কারখানা হয়েছে	মোট চাকরি হয়েছে	কারখানা বন্ধ হয়েছে	চাকুরিচ্যুত শ্রমিক সংখ্যা
১৯৮৫	২২০	১০৯০০	২০৫	১,৫০,০০০
১৯৯০	২৫২	৭৩০০	১৯৫	১,২৩,০০০
২০০১	৪১২	১৬০২৯	৩২৫	৩,৭১,০৮৬
২০০৩	২৩৮	৯১২০	৪৩২	৬,৩৫,০০০
	১১২২	৪৩৩৪৯	১১৫৭	১২,৭৯,০৮৬

সূত্র ঃ ন্যাশনাল লেবার সার্ভে, ২০০৩

গ্রামীণ গরিবদের বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন —

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ ও ব্লক স্তরের বারো হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যবসা করার স্বার্থে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ গরিব মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার যতটুকু সুযোগ ছিল তাও তারা আর পাবে না, কার্যত বিনা চিকিৎসায় তাদের মরতে হবে। একইভাবে শহরাঞ্চলের সরকারি হাসপাতালগুলিকেও সরকার ব্যয়বহুল নার্সিং হোমে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা বরাবর বলে আসছি রাজ্য সরকার চাইলেই বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইনের ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার করাতে পারে এবং পারস্পরিক ভর্তুকির ব্যবস্থাও বহাল রাখতে পারে। সিপিএম নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে 'সবই কেন্দ্রের বিষয়' বলে যা প্রচার করছে তা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। গতকাল কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান কলকাতায় এসে যা বলেছেন, তাতে আমাদের বক্তব্যই সত্য বলে প্রমাণিত হল।

তৃতীয়ত, পেট্রোপণ্যের উচ্চ মূল্যের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাপানো নানা কর-ই যে দায়ী আমাদের এই অভিযোগের সত্যতা গতকাল কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এবং রাজ্যগুলিকে বিক্রয়কর কমাতে বলেছেন। এখন কেন্দ্র-রাজ্য চাপান-উতোর চলছে, বোঝা বইতে হচ্ছে জনগণকে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সহ ১২ দফা দাবিতে আমরা ১৭ নভেম্বর সফল বাংলা বন্‌ধ করেছি, ২৫ নভেম্বর রাজ্যব্যাপী বিদ্যুতের আলো বর্জন হয়েছে, ১৪ ডিসেম্বর কৃষকদের ও ১৭ ডিসেম্বর শ্রমিকদের আইন অমান্য হবে, ২০ ডিসেম্বর যুব বিক্ষোভ হবে মদের ঢালাও লাইসেন্স ও অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে। এরপর ২ কোটি মানুষের স্বাক্ষর নিয়ে ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় মহামিছিল হবে।"

নেপাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র প্রতিনিধিত্ব করলেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

গত ৬ ও ৭ নভেম্বর নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে নেপাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত থেকে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, এ আই টি ইউ সি, সিটু, টি ইউ সি সি এবং বাংলাদেশের বি টি ইউ সি প্রমুখ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি সহ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস ও এফ আই এস ই-এর (শিক্ষকদের একটি ফেডারেশন) প্রতিনিধিরা জাতীয় সম্মেলনে যোগ দেন।

নেপালের বহু ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, যেমন এ এন টি ইউ সি, এন টি ইউ সি, এফ ই এন ই পি টি, এ এন এস এ-র পক্ষ থেকে সম্মেলনকে স্বাগত জানানো হয়।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, গিনির ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠানো হয়। ডব্লু এফ টি ইউ-র সহসাধারণ সম্পাদক কমরেড মাধবনও শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান।

সাম্রাজ্যবাদের নয়া উদারনীতি এবং ডব্লু টি ও, আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাংকের শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার জন্য শ্রমজীবী জনগণের প্রতি সম্মেলন আবেদন জানায়।

প্রকাশ্য সমাবেশের পর একটি বিরাট গণমিছিল সংগঠিত হয়। সম্মেলন শেষে নেপাল, বাংলাদেশ ও ভারতের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এক যৌথ বিবৃতিতে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে নেপালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করা হয়।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ভাষণ

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সহসভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বক্তব্যের শুরুতেই আমেরিকার সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "আপনারা সকলেই জানেন, এক সংকটময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেই এই জাতীয় সম্মেলন হচ্ছে। আজ যখন বিশ্বশান্তি ও মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু জর্জ বুশের যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে সে-ই আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বের সামনে অন্ধকার যে আরও গাঢ় হল, তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। তবে এ ধারণাও ঠিক নয় যে, জর্জ বুশের স্থানে জন কেরি জিততে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ পরিকল্পনায় কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটতো। না, তা ঘটতো না। জর্জ বুশের রিপাবলিকান ও জন কেরির ডেমোক্রেটিক — এই দুই দলই একই শাসক মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী দল।" তিনি আরও বলেন, "আজ সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার অভিযোগ ছিল নিছকই একটা অজুহাত মাত্র এবং ঐ অস্ত্র ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা ইরাকে আক্রমণ চালায়নি। অন্যদিকে এমন সিদ্ধান্ত করাও পুরোপুরি ঠিক নয় যে, শুধুমাত্র ইরাকের তেলের জন্যই এই যুদ্ধ। তেল অবশ্যই যুদ্ধের একটা কারণ এবং এই যুদ্ধে আমেরিকা যদি জিততে পারতো, তবে তেল হতো তার একটা উপরিলাভ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যুদ্ধের প্রধান কারণ তেল নয়। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ও শান্তিকামী জনগণকে গভীরভাবে বুঝতে হবে, যেটা লেনিন দীর্ঘকাল আগেই বলেছেন যে, আজকের যুগের এই ধরনের যুদ্ধগুলি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যার প্রধান কারণ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। গত শতাব্দীর সূচনাতেই লেনিন দেখান যে, বিশ্বপুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে উপনীত হওয়ার পর মরণোন্মুখ হয়েছে এবং সংকটের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। বিশ্বপুঁজিবাদের এই সংকট বাজার সংকট রূপেই প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। এই বাজার সংকটই সময়ে সময়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে দেয় এবং ইতিমধ্যেই বিভক্ত বিশ্বকে আবার বাজার হিসাবে পুনরায় নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধে যায়।" তিনি বলেন, "বর্তমানে বিশ্বপুঁজিবাদ এক তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী মন্দার পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার হাত থেকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা কোনমতেই বের হতে পারছে না, এবং তা কখন পারবেও না। একটা সংকটের সমাধান করার আগেই তারা আরও গভীরতর সংকটের মধ্যে পড়ছে।"

ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে কমরেড চক্রবর্তী দেখান, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট শক্তি যখন জার্মানি-ইটালি-জাপানের ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তিকে পরাস্ত করেছিল, তার দ্বারা কেবল সামরিকভাবেই অক্ষশক্তিকে দুর্বল করা হয়নি, সামগ্রিকভাবেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল ও কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছিল। পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ইত্যাদি দেশগুলির সংগ্রামী জনগণের সাথে হাত মিলিয়ে সোভিয়েট লাল ফৌজ পূর্ব ইউরোপের এইসব দেশগুলিকে মুক্ত করেছিল ; আবার যুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের অভ্যুত্থান সমগ্র বিশ্বে এমন এক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, অধিকাংশ উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনগুলি একটার পর একটা বিজয় অর্জন করতে শুরু করে। চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লাওস ও কিউবার মতো দেশগুলিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরকে আরও শক্তি জোগায় এবং বিপরীতে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে আরও দুর্বল ও কোণঠাসা করে দেয়। এর ফলে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন অভূতপূর্ব প্রেরণা পায়।" কমরেড চক্রবর্তী বলেন, এই পরিস্থিতি বিশ্বপুঁজিবাদের সংকটকে চরম পর্যায়ে ঠেলে দেয় এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।"

কমরেড চক্রবর্তী বলেন, "আজ পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, বিশেষত সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে এবং সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবির ভেঙে গিয়েছে, যদিও সেজন্য বাইরের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত বা কুৎসা প্রচার দায়ী নয়, দায়ী ভিতরের ক্রুশ্চেভীয় শোধনবাদীদের হাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুতি। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হারানো বাজার ফিরে পাবার ও চরম অর্থনৈতিক সংকট থেকে বাঁচবার আশায় বিশ্বায়নের নীতি চালু করার সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু এখন তারা হতাশ হয়ে দেখছে যে, বিশ্বায়ন তাদের অর্থনৈতিক সংকটের যেমন নিরসন করতে পারেনি, তেমনই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকেও কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এই দুটিই আরও তীব্র হয়েছে।"

কমরেড চক্রবর্তী বলেন, "সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের জন্ম দেয় এবং যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও বহাল থাকবে। লেনিনের এই ঐতিহাসিক শিক্ষা বারবার সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। এই সত্যেরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আমেরিকার বর্তমান যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে। মার্কিন অর্থনীতি পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ অর্থনীতির উপর।" এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য উদ্ধৃত করে কমরেড চক্রবর্তী বলেন, "আমেরিকার কাছে শান্তির অর্থ আজ মৃত্যু।" কিন্তু বর্তমানে শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের অনুপস্থিতির ফলে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সচেতন, সংগঠিত জঙ্গি শান্তি আন্দোলন ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ চক্রান্তকে প্রতিহত করার অন্য কোনও শক্তি নেই। ফলে, আজ বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, নিজ নিজ দেশের সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও দেশপ্রেমিক শক্তিকে সমবেত করে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা।"

উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে আন্তরিক আবেদন জানিয়ে কমরেড চক্রবর্তী বলেন, "কমিউনিস্টদের 'কোর' হিসাবে রেখে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সচেতন সর্বহারাশ্রেণী একথা কখনই ভুলে যেতে পারে না যে, প্রতিটি দেশেই সফল সর্বহারা বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতাসীন পুঁজিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাতে ভাঙন ঘটিয়েই একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব বহন করার সাথে সাথেই সচেতন সর্বহারাশ্রেণীকে মনে রাখতে হবে যে, দেশের বুকে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার ও তাতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি যথার্থ বিপ্লবী দল গড়ে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য। এবং আমি আশা করি, আপনারা সর্বদা লেনিনের এই মহান শিক্ষা স্মরণে রাখবেন যে, একটি সঠিক বিপ্লবী দল ছাড়া বিপ্লব হবে না।"

নেপালের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যেভাবে অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে কমরেড চক্রবর্তী বলেন, "আপনাদের এই উদ্যোগ অত্যন্ত স্বাগত। আপনাদের প্রয়াসের প্রতি আমরা সকল রকম সহযোগিতা ও সংহতি জানাতে প্রস্তুত।" সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙনের পিছনে

যুগোশ্লাভিয়ার ভাঙনের সময় থেকে যে রক্তপাত ও নৈরাজ্য তাকে গ্রাস করেছে তাকে পুঞ্জীভূত জাতি বিদ্বেষের অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু তা যে হিটলারের নাৎসি গেহ্‌লেম সংগঠনের (Nazi Gehlem Organization) উত্তরসূরী জার্মানির বিএনডি'র মত পশ্চিমের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পরিকল্পনা, মদত ও পরিচালনায় সংগঠিত হয়েছিল, তার অকাট্য বহু প্রমাণ আছে।

পূর্ব ইউরোপের এই অঞ্চল নিয়ে জার্মানির আগ্রহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। বসনীয় ও ক্রোয়েশীয়রা তখন সার্বদের বিরুদ্ধে নাৎসিদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। নাৎসিরা এই সার্বদের ইতর প্রাণী বলে গণ্য করত। ১৯৮৯ সালে সংযুক্তির পর থেকেই জার্মানি পূর্ব ইউরোপে, বিশেষ করে যুগোশ্লাভিয়ার দিকে তার সম্প্রসারণবাদী হাত বাড়াতে শুরু করল। ১৯৯০ সালে যুগোশ্লাভিয়া দখল করে তা ভেঙে ফেলার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে (সিনিয়র) জার্মানি অনুরোধ করল। বুশ সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। মার্কিন শাসকরা বহুদিন থেকেই যুগোশ্লাভিয়ার সরকার ও তার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করছিল। কারণ বাজারমুখী সংস্কার যা তখন প্রবল সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, তা চালু করতে যুগোশ্লাভিয়া অস্বীকার করেছিল। ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে দেশকে ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনায় প্রথম টার্গেট করা হয় যুগোশ্লাভিয়াকে।

যুগোশ্লাভিয়া থেকে ক্রোয়েশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি তুলল জার্মান সরকার। ক্রোয়েশিয়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে বসনিয়াও তাদের অনুসরণ করল। জার্মানি সঙ্গে সঙ্গে তাকে নতুন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিল এবং রাষ্ট্রসংঘভুক্ত দেশগুলিও তা যাতে করে, সেজন্য তদ্বির শুরু করল। নতুন ক্রোয়েশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নাৎসি পুতুল সরকারের জাতীয় সঙ্গীতই নয়, কিছু ক্ষেত্রে তাদের লোকজনকেও ভাড়া করেছিল।

ক্রোটদের মধ্যকার ফ্যাসিস্ট শক্তিরা বহুকাল ধরেই 'বিশ্ব কমিউনিস্ট বিরোধী লীগ' ও অন্যান্য নির্বাসিত গোষ্ঠীগুলোর, যাদের সি আই এ অর্থসাহায্য দিয়ে লালন করেছে, তাদের কার্যকলাপের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। মনে রাখতে হবে, অনেক ইস্ট ইউরোপীয় নাৎসিরা সি আই এ-র কার্যকলাপে যোগ দিয়েছিল, শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরেই নয় গোপনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর এদের অনেকেই প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ল। বর্তমানে লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গেরি এবং রুমানিয়ায় — এমনকি পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ করে ইটালিতেও নয়া-ফ্যাসিবাদী আন্দোলন আজ বেশ সক্রিয়। রাষ্ট্রসংঘের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পশ্চিমী দেশগুলো ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়াকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করতে লাগল। এ কাজ সি আই এ ও জার্মান বিএনডি'র মদত ছাড়া অসম্ভব। ব্রিটেন, জার্মানি ও আমেরিকার ভাড়াটে সৈন্যরা এখন ক্রোয়েশিয়ার সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি কাজ করছে। বস্তুত ১৯৯৪ সালে সিআইএ আলবেনিয়াতে একটি নতুন যুদ্ধ ঘাঁটি খুলেছে. টার্গেট করা দেশগুলোর গতিবিধির উপর নজরদারি করার জন্য।

(নর্থস্টার কম্পাস, নভেম্বর, ২০০৪ সংখ্যা)

নভেম্বর বিপ্লব কী এনেছিল

নভেম্বর ১৯১৭ - নভেম্বর ২০০৪

এক পূর্ব ইউরোপীয়ের ভাবনা

পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল কাঁধে নিয়েই যারা জন্মগ্রহণ করছে, অত্যাচার যত বীভৎসই হোক, আজন্ম অভ্যাসের ফলে ও চেতনার অভাবে তারা মনে করে এটাই দস্তুর, এটাই নিয়ম। কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজের স্বাদ যারা পেয়েছে, যারা মানুষের সম্মান পেয়েছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করেছে, মানুষের মতো বেঁচে থাকার সামগ্রিক উপকরণ পেয়েছে স্বচ্ছন্দে, রাষ্ট্র সমাজ যাদের সামগ্রিক উন্নতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে, সর্বোপরি শ্রমের মর্যাদার স্বাদ যারা পেয়েছে, তারা যদি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সেই শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত দেশে নিক্ষিপ্ত হয়, তাদের কাছে এই যন্ত্রণা তুলনাহীন। 'কী হারিয়েছি' এই যন্ত্রণা তাদের নিয়ত বিধ্বস্ত করে। আবার ঐ উন্নত সমাজের আকাঙ্ক্ষায় তারা বুক বাঁধে, সংগঠিত হতে চায়। এমনই এক ছবি আমরা পাই বুলগেরিয়ার এক প্রবীণ নাগরিক ব্লাগোভিস্তা দান-চিয়েভার স্মৃতিচারণায়। যিনি বুলগেরিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রেক্ষাপটে পরবর্তীকালে সেখানে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে জনগণ কী দুঃখ দারিদ্র যন্ত্রণার সম্মুখীন, তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি দেখিয়েছেন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর মানুষ মহান অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যা পেয়েছিল তা কীভাবে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মুষ্টিমেয় নেতার বিশ্বাসঘাতকতায় হারিয়ে গেল। তিনি দেখিয়েছেন স্বাধীনভাবে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যা যা দরকার তা সবই সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ায় ছিল। ছিল কাজের অধিকার অর্থাৎ কর্মক্ষম সকলের কাজ পাওয়ার অধিকার। অবসর জীবনে সকলেই যা ভাতা পেত তা দিয়ে মানুষের মত স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোন উদ্বেগ থাকত না। চিকিৎসা ছিল সম্পূর্ণ নিখরচায়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কারখানায়, গ্রামীণ যৌথখামারে ডাক্তার, নার্স ও দন্তচিকিৎসক সবসময় থাকত। প্রত্যেক নাগরিকের বিনাপয়সায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। সমস্ত গর্ভবতী মহিলা ও সন্তান সহ সদ্যপ্রসূতি মা বিশেষ দেখভাল ও যত্ন পেত। কর্মজীবনের মেয়াদ অনুযায়ী তারা অসুখের জন্য সবেতন ছুটি পেত। সমস্ত শ্রমিক বিনোদনের জন্য সবেতন ছুটি পেত এবং সমুদ্র সৈকত বা শৈল আবাসে রাষ্ট্রায়ত্ত স্বাস্থ্যাবাসে তারা সেই ছুটি কাটাতে পারত। রেল, বাস সহ শহরের সব যানবাহনই ছিল সস্তা। ছাত্রছাত্রীরা খুব কম ভাড়ায় সব যানবাহনে যাতায়াত করতে পারত। বিদ্যুৎ, জল, টেলিফোনও সস্তা ছিল। অপরাধ ও হিংসার বিরুদ্ধে যথার্থ সুরক্ষা ছিল। সমুদ্রতীরের বা পাহাড়ের গ্রীষ্মকালীন শিবিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাদের অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখা হত। সমস্ত অংশের কিশোর কিশোরীদের জন্য শিক্ষাচক্র ছিল। প্রবীণ, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের দেখভাল করার জন্য কিশোর কিশোরীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠত। তখন আমাদের দেশের ছোটরা সকলেই আরো শিখতে, জানতে, দক্ষ হতে, ভাল হতে, যত্নশীল ও দায়িত্বশীল হতে চেষ্টা করত।

এরপর দানচিয়েভা বলেছেন, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্নিগর্ভে জন্ম নেওয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা বাস করতে পারেনি তাদের জন্য আমার গভীর দুঃখ হয়।

পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দুর্দশা ও দাসত্ব এনেছে

ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, তা বুলগেরিয়ার মানুষের জীবনে এনেছে দুঃখ কষ্ট ও দাসত্বের শৃঙ্খল। উপরোক্ত সমস্ত সুবিধাগুলো চলে গেল। তথাকথিত নয়া-উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতি চালু হওয়ার ফলে মাত্র ৮ - ১০ শতাংশ লোক উপকৃত হয়েছে। ১৯৮৯-৯০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু নেতা 'দামের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' উঠে যাওয়ার আশঙ্কায় কিছু খাদ্য মজুত করেছিল। আর, এখন পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে বিপুল দামের ঐ খাদ্যবস্তু এনে বুলগেরিয়ায় মজুত করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় মানুষ আবর্জনাস্তূপ হাতড়ে বেড়াচ্ছে খাদ্যের খোঁজে। এই বুলগেরিয়ায় অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত অতীতের কিছু বিশেষজ্ঞ আজ ট্যাক্সি চালাচ্ছে অথবা তুর্কিস্তান বা চীনের তৈরি অত্যন্ত নিম্নমানের জিনিস কেনা-বেচা করছে শুধু তাদের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য। আজকের নতুন পুঁজিপতিরা ভ্রমণের 'স্বাধীনতা' নিয়ে খুব বড়াই করে। কিন্তু এই 'স্বাধীনতা' কারা ভোগ করে পুঁজিপতিরা ছাড়া? ভিক্ষুকদের আবার ভ্রমণের স্বাধীনতা কি? আজ শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা, টিভি-তে কেবল সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কুৎসাই করা হচ্ছে না, যুবসমাজকে সমাজতন্ত্র ও বুলগেরিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখা হচ্ছে। এই মাধ্যমগুলোতে শুধু পাশ্চাত্য অনুকরণে ও হলিউডীয় কায়দায় যৌনতা ও মাদকের প্রচার চলছে। ডাকাতি, খুন, অপরাধ আজ মহামারীর আকার নিয়েছে।

দুটি সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক যে চিত্রটা আমি অতি সংক্ষেপে, আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রাখলাম, তার থেকে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়, তা হচ্ছে, কোন্ সমাজব্যবস্থাকে মানুষের বিকাশ ও উন্নয়নে অগ্রবর্তী পদক্ষেপ বলা যাবে? কোন্ সমাজব্যবস্থা মানবজাতি বা শিশুদের সুরক্ষা দেয়? কোন্ ব্যবস্থা জনকল্যাণ ও জনগণের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে? কোন্ ব্যবস্থা মানুষকে সুসভ্য মানব হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়? ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও সমগ্র মানবজাতির সুন্দর জীবনের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অকালে প্রাণ দিয়েছে, ফাঁসির দড়ি অথবা শোষকদের অত্যাচারে মৃত্যুমুখে পড়েছে, কামান-বন্দুকের গুলিতে যাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, তারা যে স্বপ্ন দেখেছিল, কোন্ সমাজব্যবস্থা মানবজাতিকে ঐ সংগ্রামীদের স্বপ্নের কাছাকাছি নিয়ে যায়?

আসুন, আমরা ঐ সংগ্রামীদের মহৎ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করি। প্রিয় বন্ধুরা, সমাজতন্ত্রে কী ছিল, আর বর্তমানে পুঁজিবাদে কী দাঁড়িয়েছে — এই পার্থক্য যারা বোঝে, তারা হতাশ হয় না। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই পৃথিবীর সকল জনগণের জন্য একটি অগ্রসর ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল এবং মানুষ নিত্যকার জীবনযাপনে তার স্বাদ পেয়েছিল। এমন একটি ব্যবস্থা ছিল মানব ইতিহাসে প্রথম। সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭০ বছর ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর ৪৫ বছরের ইতিহাস বাস্তবে প্রমাণ করেছে যে, মহান অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল মানুষের জীবনে অবশ্যপ্রয়োজনীয়, প্রাণশক্তিতে ভরপুর ও সৃজনশীল — যা উন্নয়নের অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল।

এটা ঠিক এই ব্যবস্থার সাময়িক পতন হয়েছে, কিন্তু সেটা এই জন্য নয় যে এই ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই কিছু ত্রুটি ছিল, যে কথাটা পুঁজিপতিরা মানুষকে বোঝাতে চায়। এর পতন হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু উঁচুস্তরের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায়। এই বিশ্বাসঘাতকতার জমি তৈরি হয়েছিল বহু বছর ধরে — সম্ভবত স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকেই।

কিন্তু এটা ধ্রুবতারার মত সত্য যে, পুঁজিবাদী এই আদিম ব্যবস্থা মানব জাতির স্বাভাবিক অগ্রগতির পথকে কখনই রুদ্ধ করতে পারে না।

মানুষের এগিয়ে যাওয়ার অন্তর্নিহিত প্রবণতা এত প্রবল, এত শক্তিশালী এবং আবেগসঞ্জাত যে তাকে কখনই বেশিদিন অবরুদ্ধ করে রাখা যায় না।

[নর্থস্টার কম্পাস (কানাডা), নভেম্বর]

মার্কিন সেনাদের অপরাধের মামলা আমেরিকার আদালতে করা গেল না

ইরাকের আবু ঘ্রাইব কারাগারের বন্দীদের উপর জঘন্য অত্যাচারের ঘটনার জন্য দায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করে শেষপর্যন্ত জার্মান আদালতের দ্বারস্থ হতে হল এমনকী একটি আমেরিকান মানবাধিকার সংস্থাকেও। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য বলে কথিত আমেরিকার তথাকথিত নিরপেক্ষ আদালতের উপরও আর তাঁরা ভরসা রাখতে পারলেন না। ২০০২ সালে পাশ করা একটি জার্মান আইনের সুযোগ নিয়েছে ঐ সংস্থা, যে আইনে বলা হয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধের ঘটনা যে দেশেই হোক এবং যেকোন রাষ্ট্রের নাগরিকই তাতে জড়িত থাক, তার বিরুদ্ধে জার্মানির আদালতে ফৌজদারি মামলা করা যাবে।

কিছুটা ব্যতিক্রমীভাবেই ইউ এস সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল রাইটস্ বা সংক্ষেপে সি সি আর-এর তরফ থেকে গত ৩০ নভেম্বর বার্লিন আদালতে এই ফৌজদারি অভিযোগটি পেশ করা হয়। এই অভিযোগের পক্ষে সই করেন এমন চারজন ইরাকী নাগরিক, যাঁরা ঐ আবু ঘ্রাইব কারাগারে সেই সময় বন্দী ছিলেন ও অন্যান্যদের মত নিজেরাও হয়েছিলেন মার্কিন সেনাদের ঐ নারকীয় অত্যাচারের শিকার।

মানবাধিকার সংস্থাটির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড নিজে এবং প্রাক্তন সি আই এ ডিরেক্টর জর্জ টেনেট, প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন সিনিয়র অফিসার এবং আরও সাতজন মিলিটারি অফিসার, যার মধ্যে আছেন ইরাকে মার্কিন বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল রিকার্ডো সানচেজ প্রমুখেরা ঐ অত্যাচারের ঘটনার জন্য সরাসরি দায়ী। এজন্য যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তাদের বিচার হওয়া দরকার।

সি সি আর বলেছে, অন্য কোন উপায় না পেয়েই তারা জার্মানির আদালতে মামলা করতে বাধ্য হয়েছে। তারা আশা করেছিল যে, মার্কিন কংগ্রেস (অর্থাৎ ওদেশের পার্লামেন্ট) আবু ঘ্রাইবের বন্দীদের উপর পাশবিক অত্যাচারের যথাযথ তদন্ত করবে। কিন্তু তাদের আশা ব্যর্থ হয়েছে। সংস্থার প্রেসিডেন্ট মাইকেল র‍্যাপ্টার বার্লিনে বলেছেন, "আমি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে এসেছি — আমার আশা ছিল, আবু ঘ্রাইবের ঘটনাকে গুরুতর দৃষ্টিতে দেখে আমাদের দেশের আদালতগুলিই এই মামলার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে, কিন্তু দেখলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই পরিস্থিতি আর নেই।"

(সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত রয়টার্স সংবাদ, ১-১২-০৪)

এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

২৭ ডিসেম্বর, ২০০৪

এ আই ডি এস ও'র ৫০ বছরের সংগ্রাম ও মনীষীদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

স্থান ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ২টা

উদ্বোধক ঃ কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, *সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই*

২৮ ডিসেম্বর, ২০০৪

সর্বভারতীয় ছাত্র সমাবেশ, শহীদ মিনার ময়দান

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, *উপদেষ্টা এ আই ডি এস ও, সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই* এবং ২১টি রাজ্যের এ আই ডি এস ও নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য দেশের ছাত্র নেতৃবৃন্দ

২৯ ডিসেম্বর, ২০০৪

সংগঠনের প্রাক্তন ও বর্তমান সভ্যদের পুনর্মিলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সল্টলেক স্টেডিয়াম, সকাল ৯টা

বিশেষ অতিথি ঃ ড. সুশীলকুমার মুখার্জী, *প্রাক্তন উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*

এ আই ডি এস ও'র প্রাক্তন সভ্যদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

এ আই ডি এস ও অফিস ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ঃ ২২৪৬৩৫৮৬,
ভবেশ গাঙ্গুলী — ফোন ঃ ২৪১১০৫৫০ সলিল চক্রবর্তী — ফোন ঃ ২২৪৪০২৫১
সঞ্জিত বিশ্বাস — ফোন ঃ ৯৮৩০২৭১৩৮০ বিধান চ্যাটার্জী — ফোন ঃ ৯৮৩০১৪৪৮৬২

রাজ্য সরকার চাইলেই বিদ্যুৎমাশুল কমাতে পারে

একের পাতার পর

মাশুলের বোঝা বিনা প্রতিরোধে গ্রহণ করিয়ে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও সিপিএম ক্রমাগত এই মিথ্যাপ্রচার করে গিয়েছে যে, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই ; কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়েছে এবং এই কমিশন যখন যেমন মাশুলের হার ঠিক করে দেবে ও অন্যান্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবে, তাকে রাজ্য সরকার মানতে বাধ্য, তা বাতিল বা অমান্য করার কোন ক্ষমতা নাকি রাজ্য সরকারের নেই।

রাজ্যের মানুষ জানেন, বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনের মঞ্চ থেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকা ও এস ইউ সি আই বারবার বলেছে যে, বিদ্যুৎ কমিশনের সিদ্ধান্ত পাল্টে দেওয়ার, প্রয়োজনে তা বাতিল করার ক্ষমতা সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আছে। আইনেই এই ক্ষমতা সকল রাজ্য সরকারকে দেওয়া আছে। রাজ্য সরকারের সম্মতি না থাকলে কমিশনের সাধ্য নেই বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর।

'পারস্পরিক ভরতুকি' সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রথমত আমরা দেখিয়েছি যে, বিদ্যুৎ মাশুল স্থির করার ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের মূল বিদ্যুৎ আইনে কোথাও 'পারস্পরিক ভরতুকি' শব্দটি ব্যবহারই করা হয়নি। বরং স্পষ্টভাষায় বলা ছিল যে, বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের তুলনায় কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিদ্যুৎ মাশুল স্বাভাবিক নিয়মেই কম হবে। যেজন্য মাশুল হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ইউনিট অনুযায়ী আলাদা আলাদা স্ল্যাব চালু করা হয়েছিল। এজন্যই রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশন যখন নয়া বিদ্যুৎ আইন (২০০৩) চালু হওয়ার আগেই স্ল্যাব ব্যবস্থা তুলে দিয়ে বৃহৎ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য কম হারে ও কম বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য বেশি হারে মাশুল নির্ধারণ করেছিল, তখন অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ১৯৪৮ সালের আইন উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পুরনো ব্যবস্থা বহাল রাখার কথাই বলা হয়েছিল। অথচ, রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশন যখন সুপ্রিম কোর্টের ঐ রায়কে অপব্যাখ্যা করল, সিপিএম সরকার তাতে কোন বাধাই দেয়নি। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আইনেই সরকারকে হস্তক্ষেপ করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, বারবার আমরা দাবি জানানো সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সেই আইনি ক্ষমতাও প্রয়োগ করেনি। পরে বাইরের তুমুল আন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার বিধানসভায় একটা বিল এনে বিদ্যুতের ব্যবহার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মাশুলের হার বজায় রাখার ব্যবস্থা করে, যদিও তখনই সরকার বলেছিল তারা এটা ধীরে ধীরে তুলে দিয়ে অভিন্ন মাশুল ব্যবস্থা চালু করবেই।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু হওয়ার পর সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যেন হাতে চাঁদ পেয়ে যায়। সরকার বলতে থাকে এরপর আর রাজ্য সরকারের কিছুই করার নেই। কিন্তু এটাও ছিল আগের মতোই মিথ্যা। নয়া বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ নং ধারাতেও রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া আছে বিদ্যুৎ কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার, এমনকি তা বাতিল করার। সবচেয়ে বড় কথা, যেটা কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যানও বলে গেলেন এবং আমরা বরাবর বলে এসেছি, তাহল, বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণ থেকে শুরু করে যাবতীয় নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রশ্নে বিদ্যুৎ কমিশন রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা ও সরকারের সম্মতি ছাড়া এক পাও ফেলতে পারে না। সম্প্রতি সি ই এস সি'র গ্রাহকদের ঘাড়ে যে বিপুল পরিমাণ মাশুল ও বকেয়ার বোঝা চাপানো হয়েছে সেক্ষেত্রেও রয়েছে রাজ্য সরকারের পূর্ণ সমর্থন ও মদত। কমিশনের শুনানিতে গিয়ে রাজ্য বিদ্যুৎ সচিবই প্রস্তাব দিয়েছেন যে, গৃহস্থ গ্রাহকদের মাশুল ২ শতাংশ বৃদ্ধি করে, বৃহৎ গ্রাহকদের মাশুল ২ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হোক। ফলে এটা পরিষ্কার সিপিএম ফ্রন্ট সরকার জনগণকে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে তার আড়ালে জনগণের ঘাড়ে বিপুল হারে মাশুল ও বকেয়ার বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে। গণশক্তিতে দিনের পর দিন এবিষয়ে মিথ্যা লিখে তারা তাদের দলের কর্মী-সমর্থকদেরও বিভ্রান্ত করেছে। এই মিথ্যাচার তারা করছে জনগণের স্বার্থ বলি দিয়ে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিদেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে কম দামে বিদ্যুৎ দিয়ে তাদের মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য। বস্তুত দেশিবিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় সিপিএম যে কংগ্রেস বিজেপি ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির থেকেও বেশি আন্তরিক, এ কথা প্রমাণ করতেই অন্যান্য রাজ্য সরকারের আগেই সিপিএম সরকার এ রাজ্যে অভিন্ন মাশুল নীতি চালু করে দিয়েছে।

জনগণকে মিথ্যা বলার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে যেকোন সভ্য সরকারের অনুতপ্ত হওয়ার কথা। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের যদি ন্যূনতম অনুতাপবোধ থাকে তবে এখনই জনগণের কাছে অপরাধ স্বীকার করে বর্ধিত মাশুল সহ যাবতীয় জনবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করা উচিত। যদি তা না করে, তবে বৃহত্তর ও তীব্রতর গণআন্দোলনের আঘাতের জন্য তৈরি থাকতে হবে সরকারকে। আমরা পুনরায় দাবি করছি — (১) বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারা প্রয়োগ করে বর্ধিত মাশুল ও বকেয়া প্রত্যাহার করতে হবে। (২) কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। (৩) গরিব, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এক টাকা ইউনিট মূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে। (৪) শিক্ষায়তন, হাসপাতাল সহ সমস্ত পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে। (৫) 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' প্রত্যাহার করতে কেন্দ্রের নিকট লিখিত আর্জি জানাতে হবে।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এস ইউ সি আই তমলুক লোকাল কমিটির প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড বলরাম বর্মন গত ৫ ডিসেম্বর বেলা সাড়ে বারোটায় তমলুক জেলা হাসপাতালে ডায়াবেটিস ও কিডনির অসুখে ভুগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

তিনি বাড়সুন্দরা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬৮ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এস ইউ সি আই দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয়। ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কমিটির আন্দোলন, সেভ এডুকেশন কমিটির আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দলের পত্রপত্রিকা তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন ও সদাসর্বদা জনগণের মধ্যে দলের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন, পরিবারের মধ্যেও দলের শিক্ষা নিয়ে যান। তাঁর ভদ্র নম্র ব্যবহার ও সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সৎ, নিরহংকারী চরিত্রের জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে দল হারাল একজন বিশিষ্ট কর্মীকে।

কমরেড বলরাম বর্মন লাল সেলাম

এল কে আদবানী পুনরায় বিজেপি'র সভাপতি

ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন বেঙ্কাইয়া নাইডু। দলের হাল ধরতে ফের এগিয়ে এলেন প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। তিনি এবার নিয়ে তৃতীয়বার বিজেপি'র সভাপতি মনোনীত হলেন। তাঁকে সভাপতি করার জন্য দলের মধ্যে প্রচলিত রীতিও লঙ্ঘিত হল। 'এক ব্যক্তি এক পদ'-এর রীতি প্রযুক্ত হল না তাঁর ক্ষেত্রে। তিনি একাধারে দলের সভাপতি এবং লোকসভায় বিরোধী দলনেতা। বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর তিনি নিজেই বলেছিলেন, পাঁচ বছর পর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতারাই দলের হাল ধরবে। কিন্তু হাল ধরার প্রস্তুতিপর্বেই দেখা গেল 'সুশৃঙ্খল' ওই দলের দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতারা নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে দলের হাল বেজায় খারাপ করে তুলেছে। বেঙ্কাইয়া নাইডুর সাথে উমা ভারতীর, উমা ভারতীর সাথে প্রমোদ মহাজনের, প্রমোদ মহাজনের সাথে বেঙ্কাইয়া নাইডুর, এই রকম অনেকের সাথে অনেকের বিরোধ এখন তুঙ্গে। এই বিরোধ সামাল দিয়ে দল চালানো বেঙ্কাইয়া নাইডুর সাধ্য নয়। তিনি তাই আদবানীকে জায়গা করে দিতে সসম্মানে সরে দাঁড়িয়েছেন।

নির্বাচনসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির নিয়মই এই। নির্বাচনে দলের পরাজয় ঘটলেই দলের অভ্যন্তরে অন্তর্বিরোধ মাথাচাড়া দেয়, জোরদার হয় দলনেতা বদলের দাবি। বিরোধী গোষ্ঠীর চাপে অনেক সময় নেতৃত্ব বদলায়। তবে বলাবাহুল্য, দলের নীতির মৌলিক কোনও বদল ঘটে না। বিজেপি'র এই নেতৃত্ব বদলের ফলেও ওই দলের মূল চরিত্রে কোনও পরিবর্তন ঘটবে না। বরং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মুখোসহীন প্রতিভূ আদবানীর করস্পর্শে দল আবার নতুনভাবে সাম্প্রদায়িক কার্যক্রম অনুশীলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিজেপিকে নির্বাচনী সাফল্য এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রবীণ এই নেতার জুড়ি নেই। নির্বাচনের প্রাক্কালে মানুষকে ধর্মের আফিম খাইয়ে ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করতে তিনি মুহূর্তের মধ্যে 'রথ'-এ চড়ে বসেন। তাঁর জন্য 'রথ' তৈরীই থাকে। 'তৈরী' না বলে বরং বলা ভাল, তাঁর রথে ডিজেল ভরাই থাকে। পঞ্জিকা মতে দেবী দুর্গার দোলায় আগমনের ফল নাকি হয় ব্যাপক শস্যহানি ও মড়ক। তা আমাদের এই আদবানী দেবতার রথযাত্রার নিট ফল হয় রক্তপাত ও প্রাণহানি। ১৯৯০ সালে তাঁর রথের চাকা যেসব রাজ্যকে ছুঁয়ে গিয়েছিল সেখানেই এই ফল ফলেছিল। এই ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখেই সেবার তার রথযাত্রাকে 'রায়টযাত্রা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল।

'রায়ট'-এর কথা মনে এলেই মনে পড়ে চরম নৃশংসতায় সংখ্যালঘু নিধনের অন্যতম নায়ক নরেন্দ্র মোদির মত ঘৃণিত ব্যক্তিও আদবানীজীর বিশেষ অনুগৃহীত। তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে রাজ্য প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে তামাম গুজরাট জুড়ে মাসের পর মাস খুন, ধর্ষণ, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটল, অথচ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়মমাফিক একটা কৈফিয়ৎ পর্যন্ত আদবানী চাইলেন না নরেন্দ্র মোদির কাছে। উল্টে সাফাই গাইলেন, "গোধরার ঘটনা না হলে গুজরাট ঘটত না।" গোধরার ঘটনা কেন ঘটল, কারা ঘটালো, ঘটনার শিকারই বা হল কারা, তার রহস্য এখনও উন্মোচিত হল না। অথচ এই ঘটনাকে অবলম্বন করেই সেই সময় সারা গুজরাটে রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল, বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিষোদগারের সারা দেশে। বিগত লোকসভা নির্বাচনেও এই নিধনযজ্ঞের কাপালিক নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে ভাষণ দেওয়ানো হল বিভিন্ন রাজ্যের জনসভায়। আদবানীজীর ভাবশিষ্য হিসেবে নরেন্দ্র মোদিও বেশ 'যাত্রা'-পটু হয়ে উঠেছেন। বছর দুয়েক আগে সারা দেশের প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে 'গৌরব যাত্রা'য় বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। গুজরাট দাঙ্গায় উদ্বাস্তু হয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে চরম অবমাননাকর উক্তি করতেও তাঁর বিবেকে বাধেনি। ত্রাণশিবিরগুলোকে তিনি 'বাচ্চা জন্মানোর কেন্দ্র' বলে মন্তব্য করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের এহেন হোতাটি যাঁর শিষ্য, সেই গুরুঠাকুরটি কেমন হবেন তা সহজেই অনুমেয়।

গুরুঠাকুরটি গণহত্যায় মদত দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না। অন্তত দুটি ঘটনার হত্যাকাণ্ডের পরম্পরা বিচার করলে এই ধারণা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। (১) ১৯৯০ সালে আদবানীর রথযাত্রা রায়টযাত্রায় পরিণত হলে অযোধ্যার রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহন্ত লালদাস বিচলিত বোধ করেন এবং রথযাত্রার বিরোধিতা করে আদবানীকে ওই যাত্রা থামাতে বলেন। এরপর ১৯৯৩ সালে হিন্দুত্বের উগ্রবাদিতার বিরোধী ওই পুরোহিত নিজ বাড়িতে খুন হন। (২) ১৯৯০ সালে রথযাত্রাকালে আদবানী যে সমস্ত উত্তেজক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার তথ্যপ্রমাণ সম্বলিত নথিপত্রগুলির দায়িত্বে ছিলেন উত্তরপ্রদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আধিকারিক সুভাষ ভান। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে ওই সমস্ত নথিপত্র নিয়ে দিল্লিতে লিবেরহান কমিশনে সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছিলেন শ্রীভান। যাওয়ার পথে খোদ রাজধানীর রাজপথে তিনি খুন হয়ে যান। খোয়া যায় যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এই গুরুতর ঘটনার কিনারা করা আদবানীজীর কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সেই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তিনি যখন নিষ্ঠার সাথে বিরত থেকেছেন, তখন এই ঘটনা সম্পর্কে মানুষ কী ধারণা পোষণ করবে?

আদবানীজির গুণের সীমা নেই। অসত্য

আটের পাতায় দেখুন

জাতীয় আয়ের ৬৫ গুণ বৃদ্ধির ফলটা কারা পেল

একের পাতার পর

নির্ভর করে না। পুঁজিবাদে শিল্পায়ন নির্ভর করে মালিকদের মুনাফা হবে কি হবে না তার উপর।

তৃতীয়ত - বন্‌ধ বা ধর্মঘট নয়, লকআউট ও ক্লোজারই বর্তমানে উৎপাদনকে ব্যাহত করছে সবচেয়ে বেশি।

‘উন্নয়নে’র সুফল জনগণ নয়, মালিকশ্রেণী পাচ্ছে

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণীর উন্নয়নকেই দেশের উন্নয়ন বলে দেখানো হয়। স্বাধীনতার পর থেকে তথাকথিত উন্নয়ন যতটুকু হয়েছে, জনজীবনে তার ফলাফল কী? বর্তমান মূল্যস্তর অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে মাথাপিছু নিট জাতীয় আয় ছিল বার্ষিক ২৫৫ টাকা; ২০০০-২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬,৭০৭ টাকা, অর্থাৎ মাসিক মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ১৩৯২ টাকা; ৬৫ গুণেরও বেশি বেড়েছে মাথাপিছু জাতীয় আয়। প্রতিটি চার জনের পরিবারে এই হিসাবে ৫৫৬৮ টাকা আয় হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে জনগণের আয় কত? সরকারি হিসাবে দেশে এখন ২৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা ৩১ শতাংশ। সরকারি দারিদ্র্যসীমা হল শহরাঞ্চলে মাথাপিছু ৩১৩ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে ২৭৪ টাকা ভোগ্যব্যয়। অর্থাৎ সরকারি হিসাবেই ২৮ শতাংশ মানুষের আয়, গড় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের চার ভাগের এক ভাগেরও কম। এর ওপর আছে কোটি কোটি বেকার, যাদের আয় নেই, সংখ্যাও কেউ জানে না। তাহলে জাতীয় আয়ের ৬৫ গুণ বৃদ্ধির ফলটা গেল কোথায়? রিলায়েন্স শিল্পের নাম এখন দেশের সকলেই জানেন, এই শিল্পের মালিক মুকেশ আম্বানি কোম্পানি থেকে বছরে ১২ কোটি টাকা ‘বেতন’ নেন এর ওপর আছে শত শত কোটি টাকা করবিহীন ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ। একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের আয়ের এটা একটা নজির, এমন আরও অনেক আছে। ‘উন্নয়নের’ ফলে একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর পুঁজি বাড়ছে লাফ দিয়ে। ১৯৬৩-৬৪ সালে দেশের ২০টি বড় পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মোট সম্পদ ছিল ১৩৪৬ কোটি টাকা ১৯৮৯-৯০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪১,৫২২ কোটি টাকা। এর মধ্যে এক রিলায়েন্সের ‘উন্নয়ন’ দেখলেই বোঝা যাবে দেশের উন্নয়নের সুফল কাদের পেটে যাচ্ছে। ১৯৮১ সালে এই গোষ্ঠীর পুঁজি ছিল ২৭১ কোটি টাকা, ১৯৮৯-৯০ সালে তা বেড়ে হয় ৩৬০০ কোটি টাকা, বর্তমানে এর পরিমাণ ৮০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

অন্যদিকে জনগণের কী হচ্ছে? ‘শিল্পায়ন’, ‘উন্নয়নের’ জোয়ারে তাদের আয় কি বাড়ছে? নির্ভরযোগ্য একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে ১৯৮৮ সালে দেশের মোট কর্মরত জনসংখ্যার মাত্র ১৫.২ শতাংশ নির্দিষ্ট বেতনের চাকরি করত, ১৯৯৮ সালে সেটা আরও কমে দাঁড়ায় ১২.৩ শতাংশ। অন্যদিকে অনিয়মিত শ্রমিকসংখ্যা ৩১.২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৭ শতাংশ।

	স্বনিযুক্তি	নির্দিষ্ট বেতনের চাকরি	অনিয়মিত শ্রমিক
১৯৮৮	৫৩.৬	১৫.২	৩১.২
১৯৯৪	৫১.৯	১৪.৭	৩৩.৫
১৯৯৬	৫২.৪	১৫.৯	৩২.৮
১৯৯৭	৫২.৬	১৪.৫	৩২.৯
১৯৯৮	৫০.৭	১২.৩	৩৭.০০

‘উন্নয়নের’ ফলে বেকারি বাড়ছে

দেশে মোট বেকার প্রকৃতই কত তার হিসাব সরকার রাখে না। ১৯৭৩ সালে বি ভগবতী কমিটি হিসাব করে জানিয়েছিল দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার (১৮ কোটি) ১০ শতাংশই (১.৮৭ কোটি) বেকার। অতি সাম্প্রতিক হিসাবে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় চার কোটি। আসল সংখ্যাটা এর বহুগুণ বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) বেকার সংখ্যা ধরেছিল ১০ কোটি ৬০ লক্ষ। বর্তমানে তা আরও বেড়েছে। সাধারণভাবে যার কাজ নেই বা আয় নেই তাকে বেকার বললেও, বেকারের সরকারি মাপকাঠিটা অদ্ভুত। বছরে ২৭৩ দিন কাজ পেলে, মজুরি যাইই হোক, তাকে সরকারি হিসাবে বেকার ধরা হয় না। দিন আনি দিন খাই মজুর বাকি ৯২ দিন কী খাবে সেটা সরকারি হিসাবের বাইরে থাকে। ইউ পি এ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বছরে ১০০ দিন কাজ পাওয়ার আইনগত অধিকার দেবে। তাতে ২৭৩ দিনের মাপকাঠি ১০০ দিন নামিয়ে আনা হবে কিনা এ সন্দেহ ভিত্তিহীন নয়। বিশেষত গরিবের সংখ্যা কম করে দেখানোর জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকার দারিদ্র্যসীমার মাপকাঠি বার বার নামায় তার পক্ষে এ কাজ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বন্‌ধ হরতাল বর্তমানে যা হচ্ছে তা সত্ত্বেও শ্রমের উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। ৯৩ সাল থেকে গত ১১ বছরে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে ৪০ শতাংশ। (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১-১২-০৪) এর দ্বারা শুধু মালিকশ্রেণীর মুনাফাই বাড়ছে। দেশের ‘উন্নয়নে’র সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে ক্রমবর্ধমান হারে কাজ হারাচ্ছে এও আজ আর গোপন নেই। ২০০১-২০০২ সালের সময়সীমায়, অর্থাৎ এক বছরে সংগঠিত শিল্পে ৪ লক্ষ ২০ হাজার কর্মী কমানো হয়েছে। (ইকনমিক টাইমস ৫-৭-০৩) এর জন্য বন্‌ধ, ধর্মঘট দায়ী নয়, দায়ী পুঁজিবাদের সঙ্কট। পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার দাবি করে পুঁজিবাদী সঙ্কটের মধ্যেও তাঁদের আজব এক ‘বিকল্প’ অর্থনৈতিক নীতিতে নাকি এ রাজ্যে জনগণের স্বার্থে ‘উন্নয়ন’ হচ্ছে। পুঁজিবাদী সংকট গোপন করার উদ্দেশ্যে এ এক নির্লজ্জ মিথ্যাচার! ১৯৯০ সালের পর থেকে মুখে না বললেও সিপিএম আসলে কংগ্রেস প্রবর্তিত নয়া আর্থিক নীতিই অনুসরণ করায় বেকারসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। বিশেষত ৯০ সালের পর থেকে রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার বাড়ছে বছরে গড়ে দু-তিন লক্ষ হারে। ’৭৭ সালে এ রাজ্যে যখন সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে তখন নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ; এ বছরের মে মাসে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৬৭,৮২,৭১৪ জন, অর্থাৎ ২৭ বছরে বেড়েছে প্রায় চার গুণ।

পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ কলকারখানার সংখ্যা ৫৬,০০০ এর মধ্যে ২৭৪টি বৃহৎ শিল্প। কারখানা বন্ধ হওয়ায় কর্মচ্যুত হয়েছে ৮৬,৭০০ শ্রমিক-কর্মচারী (প্রতিদিন ২৭-১১-০৩)। এর জন্য কি ধর্মঘট, বন্‌ধ, কিংবা কর্মসংস্কৃতির অভাব দায়ী? তথ্য বলছে একেবারেই না। তাহলে এমন হচ্ছে কেন? শিল্পক্ষেত্রে এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য দায়ী পুঁজিবাদের বাজার সংকট, যে সংকটের বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপানোর জন্য মালিকরা বেপরোয়াভাবে লকআউট ক্লোজার করছে। সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী সংকটের মধ্যেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্য সরকার যে টাকা খরচ করত, নয়া আর্থিক নীতি অনুযায়ী কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই সেই খাতে খরচ কমাচ্ছে। এ দুয়ে মিলে কর্মসংস্থানের সুযোগ যে নষ্ট করছে — এই সত্য জনগণের কাছ থেকে আড়াল করতে কেন্দ্রীয় সরকার, মালিকগোষ্ঠী, বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম এক সুরে ‘যত দোষ নন্দ ঘোষ’-এর মতো ধর্মঘট বন্‌ধকে দায়ী করছে। সিপিএমও চালাকির সঙ্গে অন্যভাষায় একই কথা ঘুরিয়ে বলছে।

কর্মসংস্থানের প্রকল্পে সরকারি খরচ কমানো বন্‌ধ ধর্মঘটের জন্য হচ্ছে না। এটা করা হচ্ছে নয়া আর্থিক নীতি ও বিশ্বায়নের প্রেসক্রিপশন মতো। শিল্পপতিদের জন্য সরকারি ঝুলি উপুড় করে অনুদান দেওয়া এবং তার জন্য অর্থ সংস্থান করতে জনকল্যাণ খাতে খরচ ছাঁটাই — এই নীতির অঙ্গ। কিন্তু বাস্তবে মালিকশ্রেণীকে হাজার সুবিধা দিয়েও শিল্পায়ন করা যাচ্ছে না, কর্মসংস্থানের অর্থে। বিপুল পরিমাণে কর ছাড়, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে জল, জমি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, সরকারের কাছে মালিকদের দাবি তত বাড়ছে। বন্‌ধ কর্মনাশা, বন্‌ধ বন্ধ করতে হবে এই স্লোগানের তলায় মালিকরা আসলে যে দাবিটা করছে তা হল, বিনা প্রতিবাদে মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, লকআউট ক্লোজার মেনে নিতে হবে। মালিকশ্রেণী ও খবরের কাগজ বলছে, কথায় কথায় ধর্মঘট হচ্ছে বলেই কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। নতুন শিল্পের জন্য পুঁজি আসছে না। অথচ তথ্য বলছে এটা পুরোই মিথ্যা।

কর্মনাশা লক আউট ক্লোজার

ভারতবর্ষে শিল্পবিরোধের জন্য যত শ্রমদিবস নষ্ট হয় ইদানীং তার বেশিরভাগটাই হয় লকআউট ও ক্লোজারের জন্য, বন্‌ধ ধর্মঘটের জন্য নয়। ১৯৫১ সালে লক আউটের জন্য নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ছিল মোট নষ্ট শ্রমদিবসের ২৬ শতাংশ; ৭১ সালে তা বেড়ে হয় ৪৭ শতাংশ, ৮৫ ও ৮৭ সালে তা ৬৫ ও ৬০ শতাংশে পৌঁছেছে। ৮৯ সালে তা আরও বেড়ে ৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ‘সংগ্রামের হাতিয়ার’ বামফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গে হাল আরও খারাপ। এ রাজ্যে লকআউট ক্লোজারেই ৯৩ শতাংশের বেশি শ্রমদিবস নষ্ট হয়, ধর্মঘটের জন্য হয় ৬ শতাংশ মাত্র। (রাজ্য সরকারেরই প্রকাশিত লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ২০০১)।

ভারতীয় অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত বলছে — ‘‘লকআউটের জন্য শ্রমদিবস নষ্টের ঘটনা ক্রমাগত উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। ১৯৭১ থেকেই, বিশেষত ১৯৭৬ থেকে, এই ঝোঁক শুরু হয়েছে। এ ঘটনা খুবই উদ্বেগের। এর কারণ খুব খুঁটিয়ে বোঝা দরকার। পাঁচ বা ছয়ের দশকে ঝোঁকটা উল্টো ছিল। তখন ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস নষ্ট হত বেশি।’’ (দত্ত, সুন্দরম, ২০০৪ সংস্করণ পৃ ৭১৩)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকারি তথ্যই বলছে বন্‌ধ নয়, কর্মনাশা হল লকআউট ও ক্লোজার।

মালিকগোষ্ঠী ও তার তাঁবেদাররা ডাহা মিথ্যা কেন বলছে

বন্‌ধ কর্মনাশা, ধর্মঘট আত্মঘাতী — এই ডাহা মিথ্যা কথাটা শুধু গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচার করে করে মালিকশ্রেণী ও তাদের তাঁবেদাররা জনগণকে বোকা বানাতে চাইছে কেন? আসলে তারা জানে জনগণ দেশকে ভালোবাসে। ধর্মঘট বন্‌ধ-এ দেশের উন্নয়ন আটকে যাবে এটা বোঝাতে পারলে জনগণই বন্‌ধ ধর্মঘটের বিরোধিতা করে মালিকদের অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাতে, অবাধে ছাঁটাই করতে, শ্রমিকের প্রাপ্য টাকা, ব্যাঙ্কের ঋণের টাকা আত্মসাৎ করার সুবিধা করে দেবে। জনসাধারণকে বুঝতে হবে, আসলে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন হয় মুনাফার স্বার্থে। সেই মুনাফা আসে শ্রমিককে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে, মুনাফার দ্বিতীয় কোন উৎস নেই — এটাই কার্ল মার্ক্সের যুগান্তকারী আবিষ্কার। তাই দেখা যায়, যেখানে শ্রম সস্তা সেখানেই মুনাফা লুঠতে নিজের তাগিদেই পুঁজি দৌড়য়। ডেকে হেঁকে, ঘুষ দিয়ে, বন্‌ধ ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে, কেঁদে-ককিয়ে পুঁজি আনা যায় না। অথচ মালিকশ্রেণীর গোলাম সিপিএম নেতৃত্ব সেইপথেই চলছে এবং মালিকশ্রেণীর মোসায়েবি করছে।

সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার উল্লেখ করলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে চটকল মালিকরা পুঁজি সরাতে চাইছে। কেন চাইছে? চটকলের বৃহত্তম সিটু ইউনিয়ন তো মালিকশ্রেণীর ধামাধরা; চটকল মালিকরা খুশিমতো চুক্তিভঙ্গ করছে, পি এফের ন্যায্য পাওনা পর্যন্ত আত্মসাৎ করছে, সিপিএম সরকার ও সিটু সব মেনে নিচ্ছে; তা সত্ত্বেও মালিকরা অন্য রাজ্যে যেতে চাইছে। কেন চাইছে? মূল কারণটা আনন্দবাজারই (২৯-১১-০৪) লিখেছে — ‘‘যেখানে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের মাথাপিছু দৈনিক বেতনের হার ২৪৪ টাকা, অন্ধ্রে তা মাত্র ৫০ টাকা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে তা ৭০ টাকা...’’ কাজেই এখন ওইসব রাজ্যে আন্দোলন হলেও সস্তা শ্রমের টানে চটকল মালিকরা যাবে, বুদ্ধদেববাবু হাতে পায়ে ধরলেও তারা থাকবে না, যদি না সরকার জনগণের পকেট কেটে মজুরির ফারাকটা পূরণ করে দেয় বা অন্যভাবে পুষিয়ে দেয়। আবার সস্তা মজুরির ভিন রাজ্যে গিয়েই মালিকরা আন্দোলন বন্ধ করতে বলবে যাতে, মালিকদের যত লাভই হোক মজুরি ৫০ বা ৭০ টাকাই থাকে; শ্রমিকরা যেন মজুরি বাড়াতে না পারে। মুনাফাকে ভিত্তি করে পুঁজি চলাচলের এই বিজ্ঞানসম্মত নিয়মটাও কার্ল মার্ক্স তাঁর ঐতিহাসিক পুস্তক ‘ক্যাপিটাল’-এ দেখিয়ে গিয়েছেন। রাজ্য সরকারের ‘শিল্পায়নে’র চেহারাটা দেখলেও এর সত্যতা প্রমাণ হবে। গোড়ায় তারা শিল্পায়নের নজির হিসাবে দেখাতো হলদিয়া পেট্রোকেমকে। কিন্তু সেটা এখন ধুঁকছে। অনেকেরই সন্দেহ পেট্রোকেমের বেসরকারি একচেটিয়া পুঁজি রিলায়েন্সের কারসাজি রয়েছে এর পেছনে। এখন সিপিএম তুলছে ইনফোকমের ধুয়ো। সকলেই জানেন ভারতে কম্পিউটার সংক্রান্ত সস্তা শ্রমের জন্য উন্নত দেশ থেকে ভারতে কাজ আসছে। এজন্যই ইনফোকম শিল্পে একটা সাময়িক চাঙ্গা ভাব এসেছে। আবার, কম্পিউটারচালক শ্রমিকের মজুরি ভারতের অন্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে কম। এখানে অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত কর্মচারীর মজুরি গড়ে ছয় হাজার টাকা থেকে শুরু হয়। (দ্রঃ বর্তমান ১১-১২-০৪) তাই উইপ্রোর আদমজি থেকে শুরু করে আমেরিকার বিল গেটস পর্যন্ত আসছে পশ্চিমবঙ্গে। *যে সস্তা শ্রমের লোভে চটকল মালিকরা রাজ্য ছাড়ছে, সেই সস্তা শ্রমের লোভেই ইনফোকম মালিকরা পশ্চিমবঙ্গে আসছে। এর সঙ্গে বন্‌ধ ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।*

কিন্তু পরোক্ষ একটা সম্পর্ক আছে। আন্দোলন, ধর্মঘট ও তারই বৃহত্তর রূপ বন্‌ধ হল মালিকদের অত্যাচার শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদের শক্তিশালী হাতিয়ার। এটা কেড়ে নিতে পারলে বা সিপিএম যেমন চাইছে এটাকে ‘শেষ অস্ত্রে’ পরিণত করতে পারলে, ইচ্ছামতো মজুরি কমানো, ছাঁটাই করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মালিকরা পেতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত মালিকদের শর্ত মেনে নিলেই কি শ্রমিক কর্মচারীরা বাঁচবে? না তা নয়। কারণ পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়বে, মুনাফা অটুট রাখার জন্য মালিকদের শর্ত তত কঠোর তত বঞ্চনামূলক হবে — এর কোন শেষ নেই। বন্‌ধ ধর্মঘট কর্মনাশা — একথা বলার সাথে সাথে মালিকশ্রেণী ও নানা বিশেষজ্ঞ কমিটির কর্তারা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে পথঘাট ভালো না, বিদ্যুৎ সংকট, ভালো হোটেল, আনন্দ ফূর্তির ব্যবস্থা নেই এককথায় ‘শিল্পোন্নয়নের পরিকাঠামো’ নেই। কেন তারা একথা বলছে? কারণ তারা চাইছে জনগণের টাকায় তৈরি সরকারি তহবিল থেকে খরচ করে সরকার তাদের জন্য এগুলো করে দিক। এজন্য এখন শহর সাজানো, ফ্লাইওভার তৈরির ধুম

আটের পাতায় দেখুন

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

অনলাইন লটারির জুয়া জাঁকিয়ে বসছে

একের পাতার পর

ঘটনায় সমাজে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন যুব সংগঠন অনলাইন লটারির দোকানে বিক্ষোভ, ভাঙচুর পর্যন্ত করেছে। আন্দোলনকারী যুবকদের অবশ্যই বুঝতে হবে রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুরসভার প্রশ্রয় না পেলে এই আইনি ডাকাতি রমরমিয়ে চলতে পারতো না। ফলে এই দুই মদতদাতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গতিমুখ নির্দিষ্ট করতে না পারলে এবং প্রবল চাপের মাধ্যমে একে বেআইনি ঘোষণা করতে বাধ্য করতে না পারলে এই ব্যবসা বন্ধ করার সংগ্রাম সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না।

একই সাথে ভেবে দেখা দরকার লটারির পেছনে এত সরকারি মদত কেন? ট্যাক্স পাবে — এটাই একমাত্র সঠিক উত্তর নয়। এর অন্য এক দুরভিসন্ধিও আছে। সকলেই জানেন, পুঁজিবাদী শোষণের পরিণামে বেকারবৃদ্ধি, ছাঁটাই-লকআউট, আয়ের কোন সুনির্দিষ্ট পথ না থাকা, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি — সবকিছু মিলে মানুষের সামনে বেঁচে থাকাটাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং হতাশা উঠতি প্রজন্মকে গ্রাস করেছে। পুঁজিবাদ এদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা কেড়ে নিয়েছে। হতাশায় আচ্ছন্ন এই বিশাল শক্তির সামনে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ভাগ্যকে যাচাই করো, তুমিও বড়লোক হতে পারো, লটারি তোমার সামনে সে সুযোগ এনে দিয়েছে। এইভাবে মননজগত প্যাটার্ন করে দারিদ্রের কারণ যে পুঁজিবাদ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে এই জনশক্তিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের মানসিকতা এভাবে বিপথে চালিত করার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে অক্ষত রাখার ষড়যন্ত্রে বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএম আজ সামিল হয়েছে। শুধু গরিবরাই নয় অবস্থাপন্ন পরিবারের লোকেরা এমনকী ঘরের মহিলারাও এই জুয়াতে মেতে উঠেছে। আরও ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের এ পথে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছে।

শুধু জুয়াতে আটকে দেওয়াই নয় পরিকল্পনা মাফিক মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে নেশায় জনশক্তিকে নিষ্ক্রিয় রাখা এবং সিনেমা, টিভি ম্যাগাজিন, বিজ্ঞাপনে পত্রপত্রিকায় অশ্লীলতার বন্যা বইয়ে দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটানোর রাষ্ট্রীয় আয়োজন চলছে। একটা জাতি না খেতে পেলেও লড়ে যদি তার থাকে নৈতিক বল — কথাটি বলেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি আরও বলেছিলেন, শাসকশ্রেণী আন্দোলনকে মারতেই নৈতিকতাকে হত্যা করে। তিনি এ শিক্ষাও দিয়ে গেছেন, উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে পাল্টা গণআন্দোলনের প্রবাহ সৃষ্টি করে জাতির মেরুদণ্ড খাড়া রাখতে হবে। এস ইউ সি আই সেই সংগ্রামে রত এবং সেই সংগ্রামের ধারায় যুব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও আগামী ২০ ডিসেম্বর মদ-জুয়া-সাট্টা-অনলাইন লটারি-অপসংস্কৃতির প্রতিবাদে এবং সকল বেকারের চাকরির দাবিতে কলকাতায় যুব বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতা নয় — সকল বেকারের কাজ ও বেকার ভাতার দাবিতে এবং অনলাইন লটারি, মদের ঢালাও লাইসেন্স, অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে

২০ ডিসেম্বর

ডি ওয়াই ও'র আহ্বানে

যুব বিক্ষোভ ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন

জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার

বেলা ১২টা

বন্‌ধ কর্মনাশা নয়

সাতের পাতার পর

পড়েছে ; হোটেল, রিসর্ট, নাইট ক্লাব খুলে বেলেল্লাপনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষা স্বাস্থ্যে টাকা না দিয়ে, হাসপাতালে চার্জ বাড়িয়ে, শিক্ষায় ফি বাড়িয়ে, বিদেশের ঋণ নিয়ে, সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি বিদ্যুৎ মাশুল চাপিয়ে, শিল্পপতিদের জন্য মাশুল কমিয়ে আর 'উন্নয়নের' বুকনিতে জনগণকে বোকা বানিয়ে বুদ্ধদেববাবুরা মালিকদের আবদার মেটাচ্ছেন। মালিকরা বলছে খুশিমতো মজুরি দেওয়া, ইচ্ছামতো নিয়োগ করা এবং মর্জিমাফিক ছাঁটাই করা — অর্থাৎ প্রাপ্য না দিয়েই ছাঁটাই করা, যাকে বলে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' (লাগাও ও ভাগাও) নীতি নেই বলেই শিল্পায়ন ঘটছে না। সরকারও ক্রমাগত আইন সংশোধন করে করে মালিকদের ছাঁটাইয়ের ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। আবার, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মালিকরা যা খুশি করে যাচ্ছে, সরকার সব জেনেও না জানার ভান করে মালিকদের স্বার্থে কাজ করছে। কিন্তু তাতে কি শিল্পের সংকট কাটবে? চাকরি হবে? না, তা হবে না। সরকার নিযুক্ত এস পি গুপ্ত স্পেশাল গ্রুপ 'এক কোটি বেকারের চাকরির সম্ভাবনা' খতিয়ে দেখে ২০০১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রকে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে — 'শিল্পবিরোধ আইন সংশোধন করে মালিকদের হায়ার অ্যান্ড ফায়ারের অধিকার দিলে চাকরির সুযোগ তো বাড়বেই না বরং তার দ্বারা নিয়োগের চেয়ে ছাঁটাই বেশি হবে।'

অর্থাৎ, এটা পরিষ্কার যে আন্দোলন বা বন্‌ধ না হলেই শিল্পায়ন ঘটবে, উন্নয়ন হবে — এই ডাহা মিথ্যেটা পরিকল্পিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে, মালিকদের ও মালিকী স্বার্থের রক্ষক সরকারের জুলুমকে আরও লাগামহীন ও বাধাহীন করার উদ্দেশ্য থেকেই। পুঁজিবাদের বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় অবাধ শিল্পায়ন ও উন্নয়ন আকাশকুসুম কল্পনা বা পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচার। পুঁজিবাদী শোষণের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্য ও তার জন্য বাজারে চাহিদার অভাবই শিল্পবিকাশের আসল বাধা, এটাই সংকটের মূল যাকে দূর করা পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে সম্ভব নয়। শিল্পের বিকাশ, সমাজ ও মানবজীবনের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটাতে হলে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতেই হবে, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লবী লড়াই শেষ পর্যন্ত গড়ে তুলতে হবে। আশু দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনগুলি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইয়ের পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হবে। ক্রিয়া থাকলে প্রতিক্রিয়া থাকবেই, অত্যাচার জুলুম থাকলে লড়াই থাকবেই, ধর্মঘট হরতাল বন্‌ধ বারবার হবে। বন্‌ধ, হরতাল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গোড়ার হাতিয়ার, মোটেই শেষ হাতিয়ার নয়। তাহলে সিপিএম একে শেষ হাতিয়ার বলছে কেন? কারণ তারা শ্রমিকের আন্দোলনকে শুরুতেই শেষ করে দিতে চায়। এর বিকাশ ঘটুক — এটা তারা চায় না। সংসদীয় বিরোধী দলগুলিও নানা লড়াই ও বন্‌ধ করে ভোটের স্বার্থে, দ্বিদলীয় শাসন চালু করে পুঁজিবাদের আয়ুকে দীর্ঘায়িত করার জন্য। এর মধ্যে থেকে জনগণকে চিনতে হবে কোন্ লড়াই পুঁজিবাদবিরোধী উন্নত বিপ্লবী রুচি-সংস্কৃতির আধারে গড়ে উঠে শেষ অবধি জনগণের সংগঠিত অভ্যুত্থানের শক্তির জন্ম দেবে। কোন্ দল গণআন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রূপে গড়ে তুলে তাকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইতে রূপান্তরিত করতে চাইছে — সেটা জনগণকে বুঝতে হবে। একমাত্র তা হলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন বন্‌ধবিরোধী বুর্জোয়া মিথ্যাপ্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী!

(অন্য সূত্র উল্লেখিত না থাকলে, তথ্যসূত্র ইন্ডিয়ান ইকনমি - দত্ত ও সুন্দরম্ ২০০৪ সংস্করণ)

জি এন এম কোর্স তুলে দেওয়া এবং পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপের ছলে সরকারি হাসপাতাল বেসরকারি হাতে দেওয়ার বিরুদ্ধে ৯ ডিসেম্বর কলকাতার এসপ্ল্যানেডে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের আহ্বানে নার্স, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সারাদিন অনশন ও অবস্থান

আদবানীজীর পুনরাভিষেক

ছয়ের পাতার পর

ভাষণেও তিনি কম পারদর্শী নন। বিগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি 'উত্তর উদয়যাত্রা'য় বের হয়েছিলেন। সেই যাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন মহল থেকে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এবারেও ১৯৯০-এর রথযাত্রার মর্মান্তিক পরিণতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই আশঙ্কার জবাবে ১৯৯০-এর সেই রক্তাক্ত স্মৃতিকে 'অপপ্রচার' বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, গুজরাট বাদ দিলে বাজপেয়ীর শাসনে আর কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনাই ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে তিনি গুজরাট দাঙ্গাকে বাজপেয়ী শাসনের একটি 'কলঙ্ক' বলেও মন্তব্য করেন। অথচ এই কলঙ্কিত নায়ক নরেন্দ্র মোদিই যখন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার পালে হাওয়া লাগিয়ে গুজরাট রাজ্যের নির্বাচনে নির্বাচনী তরীটিকে জয়ের কূলে ভিড়িয়ে দেন, তখনই তাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করে নেন স্বয়ং আদবানীই। আর বাজপেয়ীর শাসনে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি বলে আদবানী যে মন্তব্য করেছেন, তা সর্বাংশে মিথ্যা। বিজেপি'র শাসনে কোন্ বছর কত দাঙ্গা হয়েছে তার একটা হিসাব প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার একটি লেখায় (ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি ২-২-০৪) দেন। সেই সংখ্যাটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

সাল	দাঙ্গার সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা	আহত
১৯৯৯	৫২	৪৩	২৪৮
২০০০	২৪	৯১	১৬৫
২০০১	২৭	৫৬	১৫৮
২০০২	২৮	১১৭৩	২২৭২
২০০৩	৬৭	৫৮	৬১১
মোট	১৯৮	১৪২১	৩৪৫৪

(সরকারিভাবে স্বীকৃত উপরের সারণীতে ২০০২ সালে দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১১৭৩ জন। বেসরকারি মতে ওই বছর শুধুমাত্র গুজরাটেই দাঙ্গার বলি হয়েছেন অন্তত দু'হাজার জন।)

শুধুমাত্র দাঙ্গা লুকানোর জন্যই যে আদবানীজী অসত্য বলেন, তা কিন্তু নয়। তিনি মিথ্যা স্বপ্নে দেশবাসীকে বিভোর করে তুলতেও চান। নিত্যদিনের মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি, নিরাপত্তার অভাববৃদ্ধির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতের আপামর জনতার রক্তচাপ বৃদ্ধির যতই কারণ ঘটুক না কেন, ভারতীয় জনতা পার্টির এই শীর্ষ নেতাটি বিগত লোকসভা নির্বাচনের পুরো প্রাক্কাল জুড়ে 'ফিল গুড' বা সুখানুভূতিতে এক্কেবারে মশগুল হয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনী প্রচারের কৌশলে দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন 'সুখানুভূতি'র প্রবল হাওয়া। সুতরাং কথার মারপ্যাঁচ খাটিয়ে মিথ্যা কথার মোহময় হাওয়া তোলাতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী। নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরে তিনি নিজেই কবুল করেছেন যে ফিল গুড তত্ত্বটি তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। অন্যদিকে অপর চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনী প্রচারটি ছিল 'ভারত উদয়'-এর। সরকারি অর্থানুকূল্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত 'ভারত উদয়'-এর উদ্ভাবক ছিল একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা। এই তথ্যও স্বয়ং আদবানীজির জবানবন্দী থেকেই জানা গেছে। সুতরাং সভাপতির পদে ইস্তফা দেওয়ার পর বেঙ্কাইয়া নাইডু তাঁর পূর্বসূরী আদবানীকে যে 'কুশলী নেতা' বলে অভিহিত করেছেন তা সর্বাংশে সত্য। ('ঝড়' পত্রিকা থেকে)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net